বাতায়ন

বৈশাখী

বাতায়ন

বৈশাখী

সম্পাদিকা ঃ

রঞ্জিতা চ্যাটার্জী

অতিথি সম্পাদক ঃ

তন্ময় চক্রবর্তী

Volume 31 | May, 2023

A literary magazine with an International reach

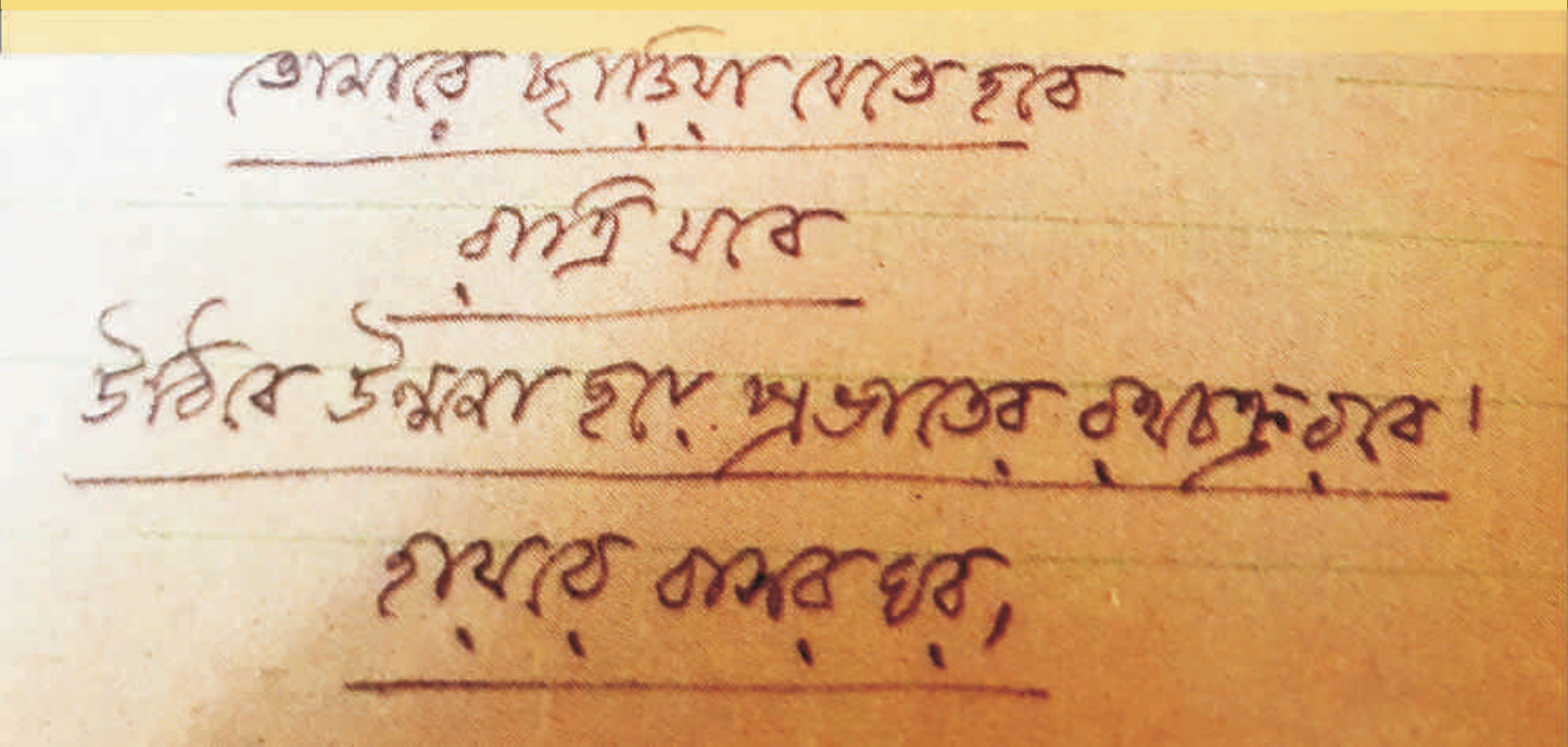

বাতায়ন

Issue Number 31 : May, 2023

ISBN: 978-0-645-57264-3

Editor
Ranjita Chattopadhyay, IL, USA

Guest Editor
Tanmoy Chakraborty

Sub Editor
Sugandha Pramanik
Melbourne, Australia

Design & Art Layout
Kajal & Subrata, Kolkata, India

Website Support
Susanta Nandi, India

Chief Editor & CEO
Anusri Banerjee
Perth, Western Australia
a_banerjee@iinet.net.au

Published By
BATAYAN INCORPORATED
Western Australia
Registration No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

Photo Credit

Front Cover : Painting by Rathindranath Tagore — collected from Thakurbarir Chitrakala, Deys Publishing.

Inside Front Cover — Rabindranath Tagore Photo : From "BALAKA" 1st edition published by Indian Press, Allahabad, India in 1916.

Title Page – বিশেষ অংশ থেকে সংগ্রহীত। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ থেকে ২০০৬ সালে প্রকাশিত।

শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবন সংগ্রহালয়ের এক অমূল্য সম্পদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত উপন্যাস 'শেষের কবিতা'র পাণ্ডুলিপি। এই প্রথম রবীন্দ্রনাথের কোনো একটি গদ্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল।

সমগ্র বইটি সম্পাদনা করেছেন বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র-অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ও রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষ সবুজকলি সেন।

Back Cover : Painting by Rabindranath Tagore — collected from Thakurbarir Chitrakala, Deys Publishing.

Back Inside Cover : Painting by Indira Chanda. অস্ট্রেলিয়ার পার্থ-এ পাকাপাকি বাস। পেশায় হলেও নেশায় চিরকালই লেখালেখি। কবিতা, গান, নাটিকা, নাটক সব ক্ষেত্রেই নিজের প্রতিভার ছাপ রেখেছেন তিনি। বহুদিন ধরে কলম ধরলেও তুলি ধরেছেন এই প্রথম। পুরোপুরি স্বশিক্ষিত শিল্পী। কবিতার বিষয়বস্তু এবং ছন্দের মতন ছবিগুলি রঙের ব্যবহার আর তুলির টান মন কাড়ে তার মননশীলতায়।

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ। রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

"আজি হতে শতবর্ষ পরে"

আজ থেকে ১৬৩ বছর আগে, ইংরাজী ৭ই মে, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। জন্মের সার্ধ শতবর্ষের বেশী সময় অতিক্রম করেও তাঁর বাণী "মন্দ্রিত সব ভুবনে"। নিজের জীবনকালে ও পরবর্তী প্রায় দেড়শো বছর সময়কাল জুড়ে দেশী বিদেশী, খ্যাত ও অখ্যাত নানাজনের মননের আলোয় বিশ্লেষিত হয়েছে তাঁর জীবন ও সৃষ্টি। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জগতে পারে এখনও কেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁকে ঘিরে সব আলোচনা পর্যালোচনা কি শেষ হয়ে যায় নি ? এ কথা অনস্বীকার্য যে রবিজীবন ও রবিপ্রতিভার সন্দর্ভে বীক্ষণ বৈচিত্র্য আনা এই মুহূর্তে খুব সহজ নয়। তবে এই প্রসঙ্গে বহুব্যবহারে ধার কমে যাওয়া একটি উপমার সাহায্য নিতে বাধ্য হচ্ছি। অনন্ত সমুদ্র থেকে হাজার হাজার গণ্ডুষ জল তুলে নিলেও সেই বারিধি যেমন অনিঃশেষ থেকে যায় ঠিক তেমনই বারেবারে চর্চিত হলেও রবীন্দ্রনাথ অতলান্ত। সত্যদ্রষ্টা কবির সৃষ্টি ও জীবনদর্শন বহুযুগ পার হয়ে আজও খুলে দেয় আলোকময় দিগন্ত। বলে দেয় নতুন পথের দিশা।

রবীন্দ্রচর্চা তাই প্রাসঙ্গিকতা হারায় না কখনোই। ১৯৯২ সালে ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এক প্রলয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে যায়। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পরে দেশের পরিস্থিতি টালমাটাল। সাহিত্য অকাদেমির তৎকালীন সভাপতি ছিলেন বিশিষ্ট কর্ণাটকী লেখক ইউ আর অনন্তমূর্তি। তিনি ভেবেছিলেন দেশে বিভিন্ন মেট্রোপলিসে, যেখানে অকাদেমির শাখা আছে সেখানেই তিনি বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করবেন। আলোচনার বিষয়বস্তু হবে রবীন্দ্রনাথের "গোরা"। ১৯০৭-১৯০৯ পর্বে রবীন্দ্রনাথ গোরা রচনা করে চলেছেন। উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯১০ সালে। প্রকাশের ৮২ বছর পরে সেই উপন্যাসে গভীর নিমজ্জনের কথা কেন ভাবতে হল ? কারণ অনুসন্ধান করলে এই উপন্যাসের গভীরে পাওয়া যাবে দেশের বর্তমান সামাজিক সমস্যার মূল চিত্রটি। শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, পল্লী উন্নয়ন, জাতিগঠন, চেতনার উন্নতি – সববিষয়েই সমস্যার মূলে তিনি আলোকপাত করেছেন। বলেছেন সমাধানের পথও। সে পথ দীর্ঘ ও কঠোর সাধনার পথ।

"রক্তকরবী" ও "মুক্তধারা" নাটকে যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হন। তাঁর এই ভাবনা পরবর্তীকালে পশ্চিমের দেশগুলিকেও প্রভাবিত করে। সম্প্রতি বিশ্বজুড়ে দেখা দিয়েছে এক পরিবেশচেতনা। রবীন্দ্রনাথ গত শতাব্দীর শুরুতেই যান্ত্রিকতার সঙ্গে জলহাওয়ার কলুষতার সম্পর্কটি বুঝতে পেরেছিলেন। নিজের সময়ের থেকে সবসময়েই অনেকটা এগিয়ে ছিলেন তিনি। পঁচিশে বৈশাখ পালন আজ বাঙালী জীবনে এক বিশেষ উৎসব হয়ে দাঁড়িয়েছে। রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রটি প্রসারিত হচ্ছে এটি আশার কথা। ভুলে গেলে চলবে না যে তাঁর সৃষ্টি কেবল কবিতা – গান-নাটকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর সৃষ্টি আক্ষরিক অর্থেই বহুমুখী। সমাজ সংগঠনের ভাবনায়, পরিবেশচিন্তায়, শিক্ষাসংস্কারের ভাবনায় তাঁর সৃষ্টিশীলতা প্রতিনিয়তই কাজ করে চলেছে। এসব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও কাজ আজও অনেকটাই প্রাসঙ্গিক।

তাঁর সাহিত্যে যে জীবনবোধ প্রতিফলিত তার প্রাসঙ্গিকতা অমলিন। মানুষ যতদিন অমানবিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবে, মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইবে সবরকম নীচতা ও ক্ষুদ্রতার বিরুদ্ধে ততোদিন তাঁর সৃষ্টির প্রাসঙ্গিকতা অব্যাহত থাকবে। তাঁর অমৃতবাণীর উচ্চারণে অন্ধকার জয় করার বীজমন্ত্র নিহিত আছে। তাঁর রচনা আজকের পৃথিবীতে আমাদের বিরাট আশ্রয়। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখার শক্তি সংহত আছে তাঁর গল্প, কবিতা, গানে।

বাতায়ন বৈশাখী সেই ঋষিকবিকে ঘুরে দেখার ফসল। বাতায়ন বন্ধুদের একান্ত ব্যক্তিগত রবীন্দ্রনাথ ধরা আছে এই সংখ্যার লেখাগুলিতে। এই অবকাশে পাঠকদের একটা আনন্দসংবাদ দিয়ে রাখি। খুব শিগগির প্রকাশিত হবে "বাতায়ন" এর মুদ্রিত রবীন্দ্রসংখ্যা – "প্রভু আমার"। "বাতায়ন বৈশাখী"র নির্মাণে আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন অতিথি সম্পাদক শ্রী তন্ময় চক্রবর্তী। পত্রিকার পক্ষ থেকে তাঁকে আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। সকলে ভাল থাকবেন।

বৈশাখী শুভেচ্ছাসহ,

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায় – গোষ্ঠী সম্পাদক, বাতায়ন পত্রিকা

চব্বিশ লাইনের সম্পাদকীয়

তন্ময় চক্রবর্তী
অতিথি সম্পাদক

“আরেকটা গান ধরো”

কেমন যেন থমকে আছে আকাশ
গানের খাতায় শঙ্খ উলু শাঁখ
ছোট্ট মেয়ে একলা দূরের দেশে
রাত পোহালেই পঁচিশে বৈশাখ

ঘরের ভিতর তোমার উপস্থিতি
রাজা তুমি আনন্দ পাঠশালায়
‘বাদল দিনের প্রথম কদম ফুলে’
‘শেষ পারানির’ শান্তি জলের মায়ায়

মাটির গানে ‘আকাশ জুড়ে বাজে’
অন্ধকারে নৌকো এল ঘাটে
নতুন লেখায় তোমায় আবিস্কারে
জুটেছে লোক ভুবনডাঙার মাঠে

নবীনরাজা, তুমিই কি সেই ঠাকুর
বটের তলায় চালচুলোহীন দেখা
তুমিই কি সেই গীতবিতান লেখো ?
তোমার জন্য মেয়েটি আজও একা

মোমের আলোয় ‘রাঙিয়ে দিয়ে’ রাগ
অচলায়তন ভাঙার খেলা যে জানতো
বাঁধ ভেঙে যাক ছোট্ট শিশুর হাতে
বারুদ গন্ধে আমরা এখনও ক্লান্ত

ভিজছে বালিশ, তোমার জন্মদিনে
কেন যে আজ এত পাগল করো
আমরা তোমায় গুরু মেনেছি ঠাকুর
আমার পাড়ায়, আরেকটা গান ধরো

সূচীপত্র বাতায়ন

স্মৃতির পাতা উল্টে

সুপ্রতীক মুখোপাধ্যায়

চরিত্রচ্যুতি 7

ভুবনজোড়া আসনখানি

সুমিতা বসু

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে 29

সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়

আনন্দগানের কথা 33

কবিতায় কবিস্মরণ

সুজয় দত্ত

আমার কবি 68

ইন্দিরা চন্দ

অমৃতের খোঁজে 69

তপনজ্যোতি মিত্র

পথের শেষ কোথায় 70

সৌমিত্র চক্রবর্তী

মানুষের ওপর... 73

সবার রবীন্দ্রনাথ

রমা জোয়ারদার

রবিঠাকুর, তোমার জন্য 37

স্বপ্না মিত্র

আমার রবীন্দ্রনাথ 40

রূপা মজুমদার

প্রেমিকা পদ্মার বুকে একাকী রবি 42

সুরজিৎ রায়

স্মৃতিকাহিনি জীবনস্মৃতিতে সংগীতের প্রসঙ্গ 44

রমা সিনহা বড়াল

আমার রবিঠাকুর 48

মহুয়া সেন মুখোপাধ্যায়

মরণ হতে যেন জাগি 50

অর্পিতা চ্যাটার্জি

অন্ধকারের অন্তরধন 53

শেলী শাহাবুদ্দিন

রবীন্দ্রনাথ, পূর্ব-পাকিস্তান ও বাংলাদেশ 55

সূচীপত্র বাতায়ন

সংগ্রামী লাহিড়ী

রাজার রাজা 60

গৌরী মৃণাল

ছিন্নপাতার সাজাই তরণী 64

স্বপ্না চৌধুরী

তোমার গানে 67

Bhajendra N. Barman

Presence of Rabindranath Tagore in Bangladesh 75

Suparna Chatterjee

In Search of GuruDeb 84

অনুবাদ

Uddalak Bharadwaj

Love and Lure, A Tagorian Perspective 86

সুপ্রতীক মুখোপাধ্যায়

চরিত্রচ্যুতি

একটি উপলব্ধি – রবীন্দ্রনাথের মানবিকতার প্রসার এবং ক্ষয়িষ্ণু বোলপুর-শান্তিনিকেতন। উপলক্ষ্য – প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি ভাষণ।

একটি স্থান কীভাবে চরিত্রলাভ করে ?

স্থানটির নিজস্ব সত্তা কীভাবে গ'ড়ে ওঠে ? কীভাবে সুপরিণত হয়, মানে পাক ধরে ?

কী বৈশিষ্ট্যে আর উপাদানে একটি স্থান বা অঞ্চল তা'র নিজস্বতা বা নিজ-পরিচিতি পায় ? আমার মতে, মানব চরিত্র-ই মূল উপাদান। মানব চরিত্র-ই মানব-কর্মের পরিচালক। মানব-কর্মের ধারা বেয়ে একটি জায়গা তা'র জন্মলগ্নের উৎস থেকে শুরু ক'রে সময়ের আবর্তে, পরিবর্তনের প্রবাহে, সুপরিণত হয়। ক্রমশ, জায়গাটির একটি চরিত্র ফুটে ওঠে। মানবিক সদ্‌গুণাবলী-ই সেই স্থানের আকর-চরিত্র, যা দীর্ঘস্থায়ী হয় বা হওয়ার কথা।

কিন্তু, মানব-চরিত্রের-ই যদি ক্ষয় বা অধঃপতন হয়, তবে তা'র প্রভাবে একটি স্থানের কী-কী পরিণতি ঘটে ?! আশ্রমের একটি চিত্র পরিবেশন করছি, পরিণতি বুঝতে। স্থান, বোলপুর শান্তিনিকেতন। কাল, ১৯০৯ থেকে ১৯৪০-এর দশক। মূল মানব-চরিত্র, শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কীভাবে মানবিকতার বিকাশ ও প্রসার ঘটে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায়, তা'র একটি নিদর্শন উপস্থাপনা করছি। প্রসঙ্গ অবতারণা-র উদ্দেশ্য হ'লো এই, যে মানবিকতার প্রসারে ও সার্বিক উন্নয়নসাধনে রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণা কীভাবে তাঁর আশ্রমিক-দের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। সেই প্রভাবে, শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক-রা আশ্রমের গণ্ডীর বাইরে মানবিক কর্মের বিস্তার ঘটান। প্রভাতকুমার ছিলেন সেই আশ্রমিক-দের অন্যতম।

নিতান্তই দুঃখের বিষয়, যে মানবিকতা ও মূল্যবোধের বিকাশে বেড়ে ওঠা এই নিদর্শন-গুলি, যেমন – বাড়িঘর, জমি-জায়গা, পরিবেশ, পরিপার্শ্ব, প্রকৃতি এবং এই সব মিলিয়ে তৈরী হওয়া একটি সম্মিলিত সচ্চরিত্র – আজ হয় বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ! তা'র স্মৃতিও প্রায় সমাধিস্থ !

কালের সঙ্গে পরিবর্তন তো আসবেই। কিন্তু, তা যদি মানব চরিত্রের বিকাশ না ঘটায় ... কেবল লোভ, লালসা, রাজনীতির সংযোগে অসাধু ব্যবসার মাধ্যমে ঘটে, তা'হলে একটি স্থান চরিত্রচ্যুত হয়। সুতো-কাটা ঘুড়ির মতো উড়তে থাকে – লোভের বশে, লাভের আশায় ... অনেক উচ্চতায় অনেক হাওয়ার দোল বদলাতে বদলাতে পরিবর্তনের মধ্যে ভেসে চলে। অবশেষে অবক্ষয় ও পতন অবশ্যম্ভাবী। জনহিতকর চেতনার উন্মেষ, সার্বিক কল্যাণ ও প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ছাড়া কোনো স্থানের-ই চরিত্র কি দীর্ঘস্থায়ী বা প্রশস্ত হতে পারে ?!

বোলপুর শান্তিনিকেতনে তিন প্রজন্মের বাস আমাদের পরিবারের। বোলপুর-পর্ব শুরু হয় যখন আমার ঠাকুরদা-ঠাকুমা, শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্তা সুধাময়ী মুখোপাধ্যায়, বাসা বাঁধেন ভুবনডাঙায়, তাঁদের গুরুপল্লী-বাসের অধ্যায় পার ক'রে। তিন প্রজন্ম পরে, সম্প্রতি, সমূলে উঠে যেতে বাধ্য হ'লাম সেই ঐতিহ্যের নীড় থেকে; মামলার নামে অসৎ ব্যবসা ও দুর্নীতির কুচক্রে ক্লিষ্ট হয়ে। রবীন্দ্র-প্রেরণায় বিকশিত হওয়া একটি নজির তিন প্রজন্মেই বিলুপ্ত ! সার্বিক উন্নতিসাধনের একটি কেন্দ্রস্থল ও তা'র নিদর্শন আজ আর নেই ! নব-প্রজন্মের কি দেখার বা জানার প্রয়োজন নেই মানব-কর্ম ও চরিত্রের ধারা ?! সেইসাথে, পারিবারিক অস্তিত্বও গত। একটি অঞ্চলে চরিত্রদানের পীঠস্থান – গত ! রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক অসৎ সংযোগের শিকার হয়ে। বোলপুর মনে রাখেনি কে বা কা'রা বোলপুরের চরিত্রদানের এবং শিক্ষাদানের তথা জীবন-মানের উন্নতিতে অংশীদার হয়েছিলেন। সেই সঙ্গে লুপ্ত হ'লো রবীন্দ্রনাথের

প্রভাবে প্রভাতকুমার ও সুধাময়ী-র কর্মযজ্ঞের কেন্দ্রস্থল ও নজির। লোভ ও লালসা এসেছে উন্নয়নের মুখোশ প'রে। ধ্বংসলীলার জয় হয়েছে!

তবু, স্মৃতির পুনরুত্থান হোক।

৭ই পৌষ ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, ২২শে ডিসেম্বর ১৯৭৩।

শান্তিনিকেতনে অর্ঘদান করা হয় প্রভাতকুমার-কে। সেই সভায় প্রভাতকুমার-প্রদত্ত স্মৃতিচারণা থেকে উপলব্ধি করি রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কীভাবে প্রভাতকুমার ও সুধাময়ী-কে বোলপুরের উন্নয়ন সাধনে উদ্বুদ্ধ করে। সেইসঙ্গে পাবো শান্তিনিকেতনে আশ্রম-জীবনের একটি নিবিড় অনুভূতি।

পূজ্যপাদ আচার্য
শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে
শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ
কর্তৃক সশ্রদ্ধ অর্ঘদান উপলক্ষে

আচার্যের আশীর্ভাষণ

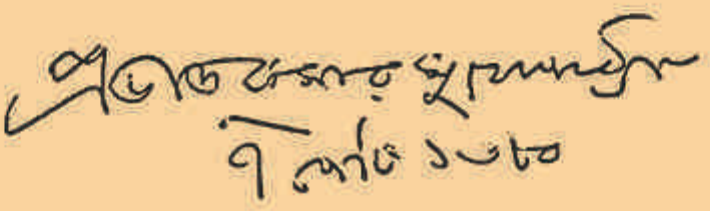

উদয়ন শান্তিনিকেতন
৭ই পৌষ ১৩৮০

Vidhusekhar Sastri with Rabindranath and
Prabhatkumar Mukhopadhyaya.

Prof. Levi with the Teachers of Shantiniketan – from left
Phanibhushan Pal, Haridas Mitra, Bidhusekhar Sashtri,
Prof. Levi, Kshitimohan Sen, Prabhat Mukherjee,
Haripada Roy and Netaibinod Goswami

তোমরা আজ আমাকে সংবর্ধনা দেবার আয়োজন করেছো এবং সেই সঙ্গে জানতে চেয়েছো আমার জীবন-কথা। কিন্তু নিজের মুখে আত্মকথা বলা তো খুবই কঠিন—আশঙ্কা হয়, অজান্তে না-জানি কোনো অহমিকার প্রকাশ ঘটে। তবুও তোমাদের অনুরোধে আমি অত্যন্ত সংকোচ ও বিনয়ের সঙ্গে আমার জীবনের কিছু-কিছু কথা তোমাদের কাছে বলছি। আজ থেকে ৬৪ বৎসর পূর্বে ১৯০৯ সালের ১০ই নভেম্বর শান্তিনিকেতনে আশ্রয় পাবার জন্য এসেছিলাম—পুজোর ছুটির পর বিদ্যালয় খুলবার দিন সকালে এসে পৌঁছোই গিরিধি থেকে হিমাংশুবাবুর সাথে। হঠাৎ গিরিধি থেকে কেন এসে পড়লাম এবং হিমাংশুবাবুই বা কে সেকথা সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন।

একটু গোড়া ঘেঁষেই শুরু করি। আমার জন্মস্থান রানাঘাট, বাবা ছিলেন উকিল, আমি পড়াশুনো করি রানাঘাট পালচৌধুরী-স্কুলে। কিন্তু সর্বনাশ ডেকে আনলো ম্যালেরিয়া—প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে আমরা দেশ ছেড়ে গিরিধি গেলাম স্বাস্থ্যলাভের আশায়, ১৯০৬ সালের পুজোর ছুটিতে। রানাঘাটে সেকেণ্ড ক্লাসে (আজকালের ক্লাস নাইন) পড়তে পড়তে গিরিধি গিয়ে ভর্তি হই ঐ সেকেণ্ড ক্লাসেই বছরের প্রায় শেষে। ফার্স্টক্লাসে প্রমোশন পেলাম সেকেণ্ড হয়ে। সবারই আশা, পাশটাস করে উকিল হবে তো নিশ্চয়ই—আরও কি হতে পারি সে কল্পনা বাপমায়ের মনে ছিল কিনা জানি না। হেডমাস্টার মশায়ের আশা স্কুলের নাম উজ্জ্বল হতেও পারে। কিন্তু বিধাতা নীরবে হাসলেন।

১৯০৭ সালের ৭ই অগস্টের সভা গিরিধিতে—সেদিন ভলাণ্টারি করে ক্লাসে গেলাম না। ৭ই অগস্টের কথা আজ লোকে ভুলে গেছে—এখন সেদিনটা ২২শে শ্রাবণ বা রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিন বলেই বিবেচিত। কিন্তু ১৯০৫ সাল থেকে বঙ্গচ্ছেদ রদ-আন্দোলন ও বৃটিশ পণ্য বয়কটের দিনরূপে ৭ই অগস্ট পালিত হয়ে আসছিল। সেই সূত্রে পূর্বোক্ত সভা, ভারতসরকারের মহাসচিব রিজ্‌লী সাহেবের ফতোয়া—ছাত্ররা সভায় যোগদান করবে না। কিন্তু সভায় হাজির হলাম ও মোড়লি করলাম। পরদিন হেডমাস্টার মশায় আমাদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ক্লাসে এসেই শুধোলেন—"গতকালের সভায় কে কে গিয়েছিলে দাঁড়াও।" ছেলেরা দাঁড়ালে তিনি বললেন—"স্ট্যাণ্ড আপ অন দি বেঞ্চ।" ফার্স্ট ক্লাসের ছেলেদের বেঞ্চের উপর দাঁড়ানোর হুকুম! সবাই দাঁড়ালো, কিন্তু আমি দাঁড়ালাম না। হেডমাস্টার প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে হুকুম করলেন—তবুও দাঁড়ালাম না। তখন বললেন—'গেট আউট'। বাস্, পাত্‌তাড়ি নিয়ে বের হয়ে

গেলাম—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়ে ধন মান অর্জনের আশা ত্যাগ করে চলে এলাম।

গিরিধিতে একটা ন্যাশনাল স্কুল স্থাপিত হয়েছিল, বাবা ছিলেন সম্পাদক। সেখানে ভর্তি হই ও সেখানে পড়ে 'ন্যাশনাল কাউন্সিল'-এর পরীক্ষা দিই। পাশ করলাম ভালোভাবে, দশ টাকা বৃত্তি পেয়ে পড়তে গেলাম কলকাতায়। মেসে থাকি। কিন্তু দশ টাকায় তো কলকাতায় চলে না—ভার নিলেন অধ্যাপক বিনয় সরকার। তিনি আমাকে খুবই স্নেহ করতেন, তাঁরই ব্যবস্থাপনায় থাকা খাওয়া হয় মেসে। সাংসারিক অবস্থা খুবই খারাপ—বাবা ভুগছেন বহুকাল থেকে। সেরে উঠলেন না—মারা গেলেন ১৯০৫-এর অক্টোবর মাসে। কি দারিদ্র্যের মধ্যে যে তখন আমাদের দিন যাচ্ছিল তা ভাবতেও ভয় হয়। যাই হোক—কলকাতায় পড়ছি নানা বিষয়ে নানা ভাষা—কিন্তু শরীর টিঁকছে না, বার বার জ্বর হচ্ছে। তখন ঠিক হলো কলকাতায় আর যেতে হবে না—যা হয় হবে। এই সময়ে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের জনৈক শিক্ষক গিরিধির হিমাংশুপ্রকাশ রায়ের মধ্যস্থতায় আশ্রমে এসে থাকবার ব্যবস্থা হলো। তখন তো রবীন্দ্রনাথের উপরই সবকিছুর ভার—কমিটি, সংসদ প্রভৃতি তখনো হয়নি। তাই স্থির হলো, শান্তিনিকেতনেই যাবো।

কয়েক মাস পূর্বে বৈশাখ মাসে যখন প্রথম আশ্রম দেখতে আসি বর্ধমান থেকে, হিমাংশুবাবুর অতিথি হয়ে, সে সময় ছিলাম পুরোনো লাইব্রেরির উপর বিরাট যে-ঘর সেই 'বল্লভী'তে। মনে পড়ছে ছাত্রদের আতিথি সৎকারের কথা—তা ভোলবার নয়। পরদিন ভোরে হিমাংশুবাবুর সাথে মন্দিরে গেলাম। সেখানে কবির ভাষণ শুনি, যা পরে শান্তিনিকেতন উপদেশমালার অন্তর্গত হয়।

আমি ন্যাশনাল কলেজের ছাত্র এই পরিচয় দিয়ে দেখা করি কবির সঙ্গে। জাতীয় পরিষদের সাথে তাঁর যে সম্বন্ধ ছিল সেকথা তিনি বললেন, আর পরিষদের সতীশ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্যরা কে কেমন আছেন জানতে চাইলেন। এই তার সঙ্গে প্রথম কথোপকথন—আমি সামান্য ছাত্র বলে অবহেলা করেননি। কিন্তু তখনো জানতাম না যে আমার ভাবী জীবনের আসন এখানে পাতা হবে—কে জানতো কয়েক মাস পরেই (১৩১৭ শ্রাবণ ১১) আমার মতো অতি সাধারণ এক তরুণের জন্মদিনকে কেন্দ্র করে কবি মন্দিরে ভাষণ দান করবেন! অ-ভাবিত! সেদিন কবি বলেছিলেন—"আমাদের এই আশ্রমবাসী আমার একজন তরুণ বন্ধু এসে বললেন, 'আজ আমার জন্ম-দিন; আজ আমি আঠারো পেরিয়ে উনিশ বছরে পড়েছি।'...আমার পরিণত বয়সের সমস্ত অভিজ্ঞতা ও চিন্তবিস্তার সত্ত্বেও আমি আমার উনিশ বছরের বন্ধুটিকে তাঁর তারুণ্য নিয়ে অবজ্ঞা করতে পারিনে। বস্তুত তাঁর এই বয়সে

যত অভাব ও অপরিণতি আছে, তারাই সবচেয়ে বড়ো হয়ে আমার চোখে পড়ছে না; এই বয়সের মধ্যে যে একটি সম্পূর্ণতা ও সৌন্দর্য আছে, সেইটেই আমার কাছে আজ উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিচ্ছে।...আমার তরুণ বন্ধুর জন্মদিনে...আমি দেখছি, তিনি একটি বয়ঃসন্ধিতে দাঁড়িয়েছেন—তাঁর সামনে একটি অভাবনীয় তাঁকে নব নব প্রত্যাশার পথে আহ্বান করছে।"

কিন্তু যে-রবীন্দ্রনাথ আমার জন্মদিনে এই ভাষণ দিলেন, তাঁকে কতোটুকু জানি তখন। ছোটবেলায় মফঃস্বলে থাকতাম—রবীন্দ্রনাথের নামও শুনিনি। মনে পড়ছে, আমাদের স্কুলের এক সভায় কলকাতা থেকে কে একজন বক্তৃতা করতে আসেন—সেই সময় 'তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে' গান শুনি। এই প্রথম রবিঠাকুরের গান শুনলাম এবং নাম জানলাম। তারপর স্বদেশী আন্দোলন এলে রবিঠাকুরের গান গেয়ে শহর প্রদক্ষিণ করেছি। অবশ্য চাক্ষুষ-পরিচয় হয় গিরিধিতে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের বাসায় ১৯০৬ সালে। তাঁর ভাষণ শুনি ১৯০৭ সালে জোড়াসাঁকো বাড়িতে মাঘোৎসবের সময়। এখানে একটা কৌতুক-কাহিনী বলি। তখন ন্যাশনাল কলেজে পড়ি—থাকি মেসে। শুনে থাকি—ঠাকুরবাড়িতে যারা মাঘোৎসবে যায়, তারা সেখানে খেতে পায়। তাই মেসের ঠাকুরকে বলে দিলাম রাতে যেন আমার চাল না নেয়। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে গেলাম—কাউকে চিনি না, টিকিট না হলে যে প্রবেশ করা যায় না তাও জানতাম না। দাঁড়িয়ে আছি—এমন সময় ঠাকুরবাড়ির আত্মীয় আমার এক পরিচিত যুবক অসহায়ভাবে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বুঝলেন ব্যাপারটা এবং দোতলার বারান্দায় নিয়ে বসিয়ে দিলেন। সন্ধ্যার পর শুনি কবির ভাষণ আর ব্রহ্মসংগীত। মনে আছে, একটি সুদর্শন বালককে দেখেছি গানের দলে বসে গান করতে। সেই বালকটি পরযুগের বিখ্যাত রাজনীতিবিদ্, সাহিত্যিক, সংগীতশিল্পী শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। যাই হোক্, সেদিন মেসে ফিরে জলে পাউরুটি ভিজিয়ে চিনি দিয়ে খেয়ে নৈশভোজ শেষ করতে হলো। তারপর রবীন্দ্রনাথের সংগে প্রথম সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হয় ১৯০৯ সালের বৈশাখ মাসে—সেকথা পূর্বেই বলেছি।

শান্তিনিকেতনে এসে প্রথম ছয় মাস কেটে গেল বিনা কাজে অর্থাৎ চাকরী না-করে। খাই-দাই ঘুরে বেড়াই—আর পড়ি। কতো বিষয়ই না পড়েছি—একমাত্র গণিত মাথায় ঢুকতো না, তাছাড়া যা পাই তা-ই পড়ি বারো-চোদ্দ ঘণ্টা করে। কবি এসব দেখে হয়তো ভেবেছিলেন, ছেলেটিকে পিটিয়ে পাটিয়ে তৈরী করে নিতে পারবেন। গ্রীষ্মের ছুটির পর কে একজন শিক্ষক চলে গেলেন—বোধহয় বরিশালের শ্রীশ রায়। আমি তাঁর স্থানে নিযুক্ত হলাম পনেরো টাকা বেতনে। অবশ্য বেতনটা ফাউ—কারণ খাওয়া পাই, স্নানের সময় তেল পাই, দাঁতমাজার জন্য খড়ি-গুঁড়ো পাই, ধোপার খরচ নেই, নাপিতের খরচও

লাগেনা—অবশ্য নাপিতের খরচ যে আমি অনেক বাঁচিয়েছি তা আমাকে দেখেই তো বুঝতে পারো। তাছাড়া অতিরিক্ত খরচের জন্য মিষ্টির দোকান, চায়ের স্টল, সিনেমাও সেসময়ে ছিলনা। বাজারে কদাচিৎ যেতে হতো কেনাকাটার জন্য—রিক্সা ছিল না, তাই পায়ে হেঁটেই যেতাম। ঘরের ভাড়াও লাগতো না, বিজলীবাতি ছিল না—লণ্ঠন দিয়ে যেতো ঘরে ঘরে। কিছুদিন পরে আলো-বাতির ভার পড়ে আমার উপর। এইতো ছিল সেদিনের আশ্রমের অবস্থা। মনে পড়ছে ১৯০৯ সালের ৭ই পৌষের উৎসব দিন—একদিনের মেলা, বসতো মন্দিরের পাশে ঐ মাঠে যাত্রা হতো দিনমানে। বাজি পুড়তো সন্ধ্যাকালে।

পড়াতে শুরু করলাম নিচের ক্লাসে—বাংলা, ইংরেজি। পরে ইতিহাস, ভূগোল—কালে ইতিহাসই হলো পড়ানোর বিশেষ বিষয়। পড়া ও লেখার বাতিক বহুকালের—'প্রাচীন ইতিহাসের গল্প' লিখলাম, ভূমিকা লিখলেন পাটনার অধ্যাপক যদুনাথ সরকার—বই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হলো ঢাকা থেকে। তখন আমার বয়স বছর কুড়ি হবে। ইতিপূর্বে ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'সোপান' ও 'ভারত মহিলা' মাসিক পত্রিকায় আমার লেখা ছাপা হয়েছে। 'ভারত মহিলা'র কয়েকটি সংখ্যায় বের হল মাদাম গেঁয়ো সম্বন্ধে প্রবন্ধ। মাদাম গেঁয়ো মধ্য-যুগের খ্রীষ্টান সাধবী—তাঁর আত্মজীবনী দু খণ্ড সদ্য এসেছিল লাইব্রেরিতে, তা পড়বার পর ঐ প্রবন্ধ লিখি।

তখন লাইব্রেরি কোথায় ছিল জানো? এখন যেটা পাঠভবনের দপ্তর এবং বছর কয়েক পূর্বে যেখানে বিশ্বভারতী সেণ্ট্রাল লাইব্রেরি ছিল তার সামনে যে বারান্দা দেখা যায় সেটা ছিল একটা বন্ধকরা ঘর—সামনে তিনটি দরজা ও একটা জানলা। সেখানেই ছিল সেযুগের লাইব্রেরি। লাইব্রেরির পাশে একটা ঘরে সংস্কৃত, পালি প্রভৃতি বইয়ের কয়েকটা শেলফ্—সেই ঘরেই পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী শুতেন তাঁর ছোট ভাইপোকে নিয়ে। আর মাঝের ঘর ছিল ল্যাবরেটরী এবং পাশে অন্য একটা ছোট ঘর—সেখানে বসতো গানের আসর। অর্থাৎ এখন যা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বিজ্ঞানভবন ও সংগীতভবন—তারই বীজ বপন করা হয় এই বাড়িতে। এই বাড়িটির ইতিহাস সংক্ষেপে একটু বলি। ১৩০৬ সালে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বাড়ি নির্মাণ করে নাম দেন 'ব্রহ্ম-বিদ্যালয়'। রবীন্দ্রনাথ যখন 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' স্থাপন করেন তখন এই তিনটি ঘরই ছিল ছাত্রাবাস। তারপর সেই বাড়ির উপর ওঠে এক বিরাট চালাঘর—পরে নাম দেওয়া হয় 'বল্লভী'। এই 'বল্লভী'র দোতলায় বহুকাল বাস করেছি ছাত্রদের নিয়ে। তাদের কতো গল্প শুনিয়েছি—'লে মিজারেবলস্', হলাণ্ডের স্বাধীনতার ইতিহাস, অ্যাবটের লেখা নেপোলিয়নের জীবনী, 'আইভ্যান হো'-র কাহিনী প্রভৃতি। মনে পড়ছে, প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হলে স্টেটসম্যান পত্রিকা থেকে প্রদত্ত একখানা যুদ্ধের ম্যাপ খুলে ছাত্রদের দেখাতাম যুদ্ধে কে কতোটা

এগুলো পিছুলো। তখন মনে মনে সবাই কামনা করছে ইংরেজ হারুক, মরুক। অর্থাৎ আমরা ইংরেজদের কিছু করতে পারছি না বলে অন্যে ইংরেজকে বিব্রত করছে দেখতে পেয়েও খুশি হতাম। বলাবাহুল্য, এটা দুর্বলের ভাবনা।

সে সময়ে তো আশ্রমে এখনকার মতো বিভিন্ন 'ভবন' ছিল না—একমাত্র ছিল বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়টিকে ঘিরেই ছিল সকলের ঐকান্তিক প্রয়াস। এখন যেখানে 'নূতন বাড়ি' সেখানেই ছিল শিশু বিভাগ। অন্য সব গৃহাদি পরবর্তীকালে নির্মিত হয়। 'নাট্যঘরে'ও ছেলেরা থাকতো। তোমরা এখন 'নাট্যঘর' বলতে বোঝো 'বিচিত্রা'র পেছনে যে বিরাট লম্বা ঘর আছে সেটিকে। কিন্তু যে-নাট্যঘরের কথা আমি বলছি, সেটি ছিল আশ্রমের মাঝে 'প্রাক্-কুটিরে'র পঙ্‌ক্তিতে—ঘরটি বহুকাল আগে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এই ঘরে রবীন্দ্রনাথ বহুবার ছাত্র-শিক্ষকদের নিয়ে অভিনয় করেছেন—শারদোৎসব, প্রায়শ্চিত্ত, অচলায়তন, ফাল্গুনী। ঐ নাট্যঘরে কবির অভিনয় দেখবার জন্য কলকাতা থেকেও অনেক লোকজন আসতেন। অভিনয়ের মহড়াও হতো ঐ ঘরে—ছাত্ররা প্রতিদিন দেখতো, শুনতো। ফলে নাটকের অনেক অংশ তাদের মুখস্থ হয়ে যেতো। শ্রোতা-দর্শকদের জন্য নির্দিষ্ট একটা দিনেই অভিনেতারা রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হতেন না—এইভাবে অভিনেতাদের সাথে শ্রোতা-দর্শকদের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠতো। প্রসঙ্গত বলি, অন্যদেশ হলে বিশ্বকবির স্মৃতি-বিজড়িত এই 'নাট্যঘর'কে যথাযথভাবে রেখে দেওয়া হতো। রাশিয়াতে দেখেছি লেনিন, পুশকিন, টলস্টয় প্রভৃতি মহান ব্যক্তিদের স্মৃতি কী সুন্দর অপরিবর্তিতভাবে রক্ষিত হয়েছে।

সেদিনের বিদ্যালয় ছিল ছোটো—ছাত্রসংখ্যা শ-দুয়েকের মধ্যে। শিক্ষকরা ছাত্রদের সঙ্গে থাকতেন—খেতেন রান্নাঘরে। আশ্রমের সব কাজ তাঁদেরই দেখতে হতো। আমি এখানে এসে ভার পেলাম আলো-বাতির তদারকীর—সেকথা আগেই বলেছি। তাছাড়া বহুবৎসর আমার উপর ভার ছিল পরিচ্ছন্নতা তদারক করা অর্থাৎ বিশেষভাবে মেথরদের সর্দারী করা। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়লো। শুনলাম, মেথররা কাবুলিওয়ালাদের কাছ থেকে টাকা ধার করে সুদ দিয়ে যাচ্ছে মাসের পর মাস—কতো যে দিয়ে যাচ্ছে তা নিজেরাই জানে না। কাবুলিরা আসল চায় না কখনো, সুদ পেলেই খুসি। আমি কাবুলিওয়ালাদের ডেকে পাঠাই। বললাম—"আমি তোমাদের প্রাপ্য আসল টাকা দিয়ে দেবো, সুদ আর পাবে না, মাসে মাসে আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে যেও।" তারা খুসি হয়ে রসিদবই থেকে প্রয়োজনীয় পাতাগুলো ছিঁড়ে আমাদের দিয়ে দেন। সেই থেকে তাদের সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে যায়—একজন তো প্রায় আমাদের ঘরের লোক হয়ে গেলো। ছেলেদের জন্মদিনে উপহার আনতো কতোরকমের—মনে পড়ে যেতো রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালার

কথা।

তখনও ক্লাস বসতো গাছতলায়, বৃষ্টি পড়লে ঘরে বা বারান্দায় যেতাম। তবে 'ক্লাস' আজকালকার মতো নির্দিষ্ট ছিল না—যে ছেলে যে-বিষয়ে যোগ্য তাকে সেই 'বর্গে' যেতে হতো। কোনো বিষয়ে কাঁচা ছাত্রকে শিক্ষকরা অবসর সময়ে পড়াতেন—তারজন্য কোনো উপরি আশা করতেন না। আমরা শিক্ষকরা জানতাম ছাত্রদের জন্যেই তো এখানে এসেছি, অভিভাবকরা তাদের রেখে গেছেন আমাদের কাছেই। শুনেছি, পরে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনেই পিছিয়ে-পড়া ছাত্রদের জন্যে প্রাইভেট টিউশনী শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং সে জন্যে অভিভাবকরাও পৃথক টাকা দিতেন।

হাসপাতালে ছাত্র-শিক্ষক বা কর্মী অসুস্থ হয়ে থাকলে সবাই পালাক্রমে সেবা করতেন। হাসপাতালটি যে কোথায় ছিল, তা সেই জায়গায় না নিয়ে গেলে বোঝানো যাবে না। 'সংক্ষেপে বলি—মৃণালিণী' পাঠশালার পেছনে পথের ধারে ছিল সেযুগের হাসপাতাল। আবাসিক ডাক্তার তখন ছিল না। বোলপুর হাসপাতালের হরিচরণ মুখুজ্যে আসতেন রোজ সকালে নিজ ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে। খুব বাবু ছিলেন তিনি—আসতেন একেবারে ফিট্‌ফাট্‌ হয়ে। তখন তিনিই ফিজিশিয়ান, তিনিই সার্জেন। হাসপাতালের সেবক ছিলেন অন্নদা বর্ধন—ত্রিপুরায় বাড়ী। আর ছিলেন চট্টগ্রামের অনঙ্গ চক্রবর্তী। পরে আসেন ঢাকার অক্ষয় রায়, যিনি এক সময় গান্ধীজীর 'ডান্ডি' অভিযানে যোগ দিয়েছিলেন।

বিশেষভাবে মনে পড়ছে শরৎ রায়ের কথা। বরিশালের লোক তিনি। এমন একনিষ্ঠ কর্মী দেখিনি। পড়াতেন গণিত, চর্চা করতেন ইতিহাস—তাঁর লেখা 'শিখগুরু ও শিখ জাতি', 'শিবাজী ও মারাঠা' প্রভৃতি বই এককালে সমাদৃত হয়েছিল। এইতো তাঁর বাইরের খবর। আশ্রমে তিনি দেখতেন রান্না-ঘরের কাজকর্ম এবং হিসাবপত্র। ভোরে উঠে তাঁর কাজ ছিল চাকরদের ডেকে তোলা। সেকালে ছেলেরা ভোরে স্নান করতো কুয়োর পাড়ে। তাঁদের স্নানের জন্যে টাট্‌কা জল তুলে চৌবাচ্চা ভরতে হতো। ঠাকুরদের ডেকে তুলে ছাত্রদের জন্য সকালের জলখাবার তৈরীর ব্যবস্থাও করতেন তিনি, আর বিকেলে বসতো তাঁর চায়ের আসর রান্নাঘরের দাওয়ায়—আমরাও তাতে যোগ দিতাম।

ভোরে উঠতে হতো আমাদেরও সেই অন্ধকার থাকতে—আজ ৮২ বৎসর বয়সেও সেই অভ্যাস রয়ে গেছে। সেকালে চারদিকে তো মাঠ আর খোয়াই—প্রাতঃকৃত্য করবার জন্য ওখানেই যেতে হতো। বহুকাল ছেলেদের ব্যায়াম করাতাম শালতলায়, সঙ্গে সঙ্গে নিজেও করতাম। তখনও অন্ধকার, তাই লণ্ঠন নিয়ে কাপ্তান রোল হাঁকছে। ব্যায়াম মানে ডন, বৈঠক, লাফালাফি—ব্যাস্‌। তারপরই স্নান। স্নানের পর উপাসনার জন্য মিনিটদশেক বসবার

যোগ দিতেন সমবেত উপাসনায়—সমবেত হয়ে মন্ত্র উচ্চারণের মধ্যে সংঘশক্তি আছে নিশ্চয়ই, হয়তো ব্যক্তিগত ধ্যান ও সংঘগত মন্ত্রউচ্চারণ সমাজজীবনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। জানি না, তার ফল কি হয়েছে।

সেদিনের কথা ভাবতে গিয়ে মনে পড়ে যায় ক্ষিতিমোহন সেন বা 'ঠাকুর্দা'র কথা। তিনি ছিলেন সকলের সমবয়সী। রোজ বিকালে বেড়াতে যেতাম তাঁর সঙ্গে। সেই ভ্রমণ ছিল পেরিপেটেটিক স্কুল—কতো আলোচনাই না হতো নিয়ম ছিল—নীরবে শান্ত হয়ে বসে থাকার আয়োজন সেটা। এরপর সবাই পথ চলতে চলতে। মনে তো পড়ে অনেক-অনেক কথা—কতোই বা বলি।

পুরাতন সেণ্ট্রাল লাইব্রেরির পাশে যে বিরাট টিনের লম্বা ঘর ছিল সেটি ছিল ভোজনালয়—তার পাশে ছিল পাকা রান্নাঘর। আমরা সবাই মেঝেয় বসে খেতাম পিঁড়ি পেতে। ১৯১৫ সালের প্রবল ঝড়ে উড়ে যায় রান্নাঘরের টিনের চালা, তারপর পত্তন হয় আধুনিক পাকশালার। সেকালে পাচক ছিল বাঙালী ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ ছাড়া পাচক হতো না। আদিত্যপুরের ভুঁড়িঠাকুর ছাড়াও শিবু ঠাকুর, নরেন ঠাকুর, গাঙ্গুলি মশায় প্রভৃতির নাম মনে আছে। রান্নায় ওস্তাদ ছিলেন গাঙ্গুলি মশায়—বাড়ি বরিশাল, শুনতাম কবির জামাতা নগেন গাঙ্গুলিদের দূর-কুটুম্ব আর মৌলভী আকরম খাঁর আত্মীয়। একবার গাঙ্গুলি মশায় ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছেন, তার পরিবর্তে পাচক হলেন নরেন ঠাকুর। রান্নাঘরে তখন ব্রাহ্মণ শিক্ষক ও ছাত্ররা পৃথক পঙ্‌ক্তিতে বসতেন—তাঁরা নিরামিশাষী। তখন রান্নাঘরে মাছ মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল—তবে আমিষ বলতে বুঝাতো পেঁয়াজ। যারা পেঁয়াজও খেতেন না, তাঁরা নিরামিশাষী। নিরামিশাষী হরিবাবু ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। গাঙ্গুলি মশায় বাড়ি গেলে নরেন ঠাকুরের রান্না তাঁর মুখে ভালো লাগে না। গাঙ্গুলি দেশ থেকে ফিরে এলে নরেন ঠাকুর তাঁকে শুধুলো—"এতো যত্ন করে মুগের ডাল রাঁধি, অথচ হরিবাবুর মুখে রোচে না। কেবলই বলেন 'গাঙ্গুলির মতো হয় না হে।' তুমি কি তুক করেছ?" গাঙ্গুলি বললেন—"ওঁরা পেঁয়াজ খান না তো—নিরামিষ রান্না মুখরোচক করবার জন্য আমি মুগের ডালে পেঁয়াজের রস দিতাম—পেঁয়াজ দিতাম না। তাইতো স্বাদ হতো।" আর একটা কাহিনী বলি। একদিন নিরামিষ ঝোলে মাছের টুকরো পাওয়া গেলো কারও পাতে। হৈ-হৈ ব্যাপার এই নিয়ে! শেষকালে জানা গেলো নিরামিষ ঝোলে মাছ সিদ্ধ করে নিতেন ঠাকুরমশায়রা নিজেদের জন্য। যা হোক্, এই নিরামিষ ভোজন চালু হয় ১৯০৫ সালের পর। আদি রান্নাঘর শান্তিনিকেতন সীমানার বাইরে নির্মিত হয়, কারণ সেই চৌহদ্দীর মধ্যে জীবহত্যা নিষিদ্ধ ছিল মহর্ষিদেবের ট্রাস্টডীড্ অনুসারে। তারপর ভূপেন সান্যাল মশাই যখন ভার পেলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম চালাবার, তখন থেকে নিরামিষ ভোজন চালু হয়—আমি

যখন আসি তখন নিরামিষ আহার-পর্ব চলছে। তবে বাইরে পিক্‌নিক প্রভৃতিতে গিয়ে ছাত্র-শিক্ষকরা পুরোপুরি আমিষ-খাদ্য খেতেন। আমি কিন্তু বাইরে কখনো মাছ-মাংস খাইনি।

শান্তিনিকেতনে দীর্ঘকাল ছিলাম। রবীন্দ্রনাথকে পেয়েছিলাম কাছে—বস্তুতঃ আমার পড়াবার হাতে-খড়ি হয়েছিল তাঁর কাছেই। তিনি ক্লাশ নিতেন আমার পাশে বসে, আর আমি তাঁর সেই শিক্ষাপদ্ধতি অনুধাবন করতাম। মনে পড়ে, বিভিন্ন সভায় একত্রে বসে কতো তর্ক-বিতর্ক করেছি। আটই পৌষ বিশ্বভারতী পরিষদের বার্ষিক সভা হতো। তখন কলকাতা থেকে বহু সদস্য আসতেন। কলকাতার সদস্যরা একবার প্রস্তাব করলেন বাইরে থেকে আশ্রমসচিব আনা হোক্। আমি প্রতিবাদ করলাম—'এ কখনোই হতে পারে না' নেপালচন্দ্র রায় ছিলেন আমার সপক্ষে। কবি এসে ভাষণ দিলেন প্রস্তাবের পক্ষে—এই প্রস্তাবের প্রতিবাদীরা সবাই নীরব। আমি বললাম—'ভোট নেওয়া হোক্।' অবশ্য আমি ছাড়া কেউ-ই হাত তুললেন না, ভোটে পরাজয় হলো। কিন্তু শেষপর্যন্ত নানা কারণে সে-সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয়নি। ভাবলে খুবই অবাক্ লাগে—কবি আমাদের কতো ভাবেই না প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। অন্নদাতা বলে আমাদের উপর কখনো জুলুম করেননি।

একদিন এই শান্তির নীড় ছেড়ে কলকাতা চলে যাই সিটি কলেজের গ্রন্থাগারিকের চাকরী নিয়ে। আশ্রম ত্যাগের কারণটা অতি তুচ্ছ—কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতভেদ। রবীন্দ্রনাথ তখন বিদেশে, তিনি থাকলে হয়তো এমনটি ঘটতো না। কিন্তু মনটা পড়ে থাকতো এখানে—তাইতো ছুটিছাটা পেলেই চলে আসতাম। কলকাতায় 'বিচিত্রা' ক্লাব তখন শুরু হয়েছে—সেখানেও যাই। সে-একটা যুগ গিয়েছে বাঙালী সাহিত্যিকদের। মনে পড়ে, সিটি কলেজের লাইব্রেরিতে কাজ করছি এমন সময় নেপালচন্দ্র রায় হঠাৎ দেখা করতে এলেন। কথায় কথায় বললেন—"তুমি আশ্রমে ফিরে চলো, গুরুদেবের একান্ত ইচ্ছা।" শোনামাত্রই মনস্থির করে ফেললাম, পদত্যাগ-পত্র পাঠিয়ে দিলাম অধ্যক্ষের কাছে। অধ্যক্ষ-অধ্যাপকরা সকলেই বিস্মিত হয়ে গেলেন। অধ্যক্ষ হেরম্ববাবু পাঠালেন অধ্যাপক রজনীকান্ত গুহ মশায়কে কথা বলার জন্য। তাঁকে বললাম—"আমার মন চাইছে শান্তিনিকেতনে যেতে—আমাকে যেতে হবেই।" ফিরলাম শান্তিনিকেতনে ১৯১৮ সালের পুজোর পর। সেই থেকে ১৯৫৪ সালের ২৭শে জুলাই পর্যন্ত কাজ করে ৬২ বৎসর পূর্ণ হলে বিদায় নিলাম।

ব্যক্তিগত আর একটা কথা এখানে বলি, যা আমার জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষা পরিষদে 'হেমচন্দ্র বসু মল্লিক অধ্যাপক'-পদে থাকাকালীন মাসিক দেড়শো টাকা বেতন

পেতাম—ভাষণ দিতাম বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে। সেই টাকা থেকে ভুবনডাঙ্গার বাড়ির পত্তন করি, আদিত্যপুরে ধানের জমি কিনি। ফলে একদিকে আমার সাথে বোলপুরবাসীদের যোগাযোগ হলো, অপরদিকে গ্রামের জমি কেনায় গ্রামের বিচিত্র সমস্যা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হলাম। বোলপুর থানার চৌহদ্দীর মধ্যে শহরের একমাত্র যে প্রাইমারী স্কুল ছিল তার জন্য জমিসংগ্রহ করা, গৃহ-নির্মাণের জন্য সরকারী অর্থসাহায্য আদায় প্রভৃতি বিচিত্র কাজে জড়িয়ে পড়ি তখন—সেই পাঠশালা আজকের বোলপুর বালিকা বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে গঠন-পর্বে যাবতীয় বাইরের ঝামেলা আমাকেই বহন করতে হতো—আভ্যন্তরিক দায়-দায়িত্ব অর্থাৎ পড়াশুনা, নিয়মাবলী প্রণয়ন ইত্যাদির ভার নিয়েছিলেন আমার স্ত্রী, সেই গোড়া থেকেই। সেই সাংগঠনিক-কাহিনী আর বিস্তৃত করতে চাই না।

গ্রামের ক্ষেতে জলসেচের জন্য বাঁধ বা পুষ্করিণী পুনরুদ্ধারের কাজে লিপ্ত হই। এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করে আমাকে তালতোড় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হতে হয়েছিল। নিজ মুখে বলতেও সংকোচ হচ্ছে—এই পদে থাকাকালীন কিছু জনহিতকর কাজ বিশেষভাবে জলসংকট ও শিক্ষাসংকট নিরাকৃত করবার চেষ্টা করেছিলাম, যার কথা পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকে বহুকাল মনে রেখেছিল এবং যার জন্য সরকারও আমাকে পুরস্কৃত করেছিলেন।

১৯৩৫ সালে পুজোর সময় ভুবনডাঙ্গার নিজ মাটির বাড়িতে উঠে এলাম গুরুপল্লীর বাসা থেকে। এখানে এসে বোলপুর শহর ও গ্রামের সঙ্গে যে-সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার আভাস তো দিয়েছি একটু আগেই। প্রায় শতাব্দী কাল পূর্বে রায়পুরের জমিদাররা এই গ্রামের বিরাট 'বাঁধ' বা জলাশয় তৈরী করে গ্রামের পত্তন করেছিলেন, তারপর সংস্কারের অভাবে ক্রমশঃ বাঁধটি মজে আসে—গ্রামে এসেই 'বাঁধ'টির ক্ষীয়মাণ রূপ দেখে চিন্তিত হলাম। বৎসর-খানেকের মধ্যে 'বাঁধ' কাটাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। দেশে তখন প্রায়-দুর্ভিক্ষ অবস্থা, ছয় পয়সা সের দরে চাল কেনার ক্ষমতাও লোকের নেই। কো-অপারেটিভ থেকে এক হাজার টাকা ধার করা হলো, আর রবীন্দ্রনাথ দিলেন একশো টাকা—এই স্বল্প টাকা নিয়ে 'বাঁধ' সংস্কার করলাম। তারপর যথাসময়ে সেই বিরাট জলাশয় জলপূর্ণ হলে, তীরে বৃক্ষরোপণ উৎসব অনুষ্ঠিত হলো—কবি সেদিন গ্রামের এই জলাশয় প্রসঙ্গে ভাষণ দেন। মোট-কথা জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অর্থে আমি পেলাম একদিকে শহর অপরদিকে গ্রাম—আজও এই শহরতলী ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক দূর হয়নি।

শান্তিনিকেতন থেকে কী পেয়েছি তা কেমন করে তোমাদের জানাবো এই স্বল্পকালীন-সভায়। আমি যা-কিছু করেছি, যা-কিছু হয়েছি, যে-সম্মান

নানা স্থান, প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেয়েছি তারজন্য চিরকৃতজ্ঞ আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথের কাছে, আর সমকালীন ছাত্র-অধ্যাপকদের কাছে। এই সূত্রে একটা কথা বলি—শান্তিনিকেতনে আমার বিদ্যালয়-শিক্ষালয়-দেবালয় ছিল বিশ্বভারতী-গ্রন্থাগার। সেই সময়ে মাত্র কয়েক হাজার বই সম্বল করে কীভাবে যে এই গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল, সে-কাহিনী এখানে বলা সম্ভব নয়। আমি ৬২ বৎসর পর্যন্ত ছয়-সাত ঘণ্টা করে কাটিয়েছি এই গ্রন্থাগারে। তোমরা বোধহয় জানো, আমি গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানী নই—অর্থাৎ যেমন এদিকেও কোনো পাশ নই, গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানেও তথৈবচ। তবু আমার 'বাংলা বর্গীকরণ' আজ পশ্চিমবঙ্গ এমনকি বাংলাদেশেও অনুসৃত হচ্ছে এবং আমার সংস্কৃত-বর্গীকরণ পদ্ধতি বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে অনুসৃত হয়। বহু বৎসর নিখিল ভারতীয় গ্রন্থাগার-সম্মেলনের আমি ছিলাম প্রথম উপ-সভাপতি, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সমিতির সভাপতিও ছিলাম। গ্রন্থাগারিক হয়ে গ্রন্থ পড়তাম, বলা যেতে পারে আই গ্রু উইথ দি লাইব্রেরী এ্যান্ড লাইব্রেরী গ্রু উইথ মি। গ্রন্থপাঠ করা আমার জীবনের সঙ্গে আজও ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে। তাই আজ নিজ-গৃহে আমার প্রয়োজন মতো গ্রন্থাগার গড়ে তুলেছি—এই গ্রন্থাগারই আমার বর্তমান 'কর্মকেন্দ্র'।

আজ প্রায় ৬০ বৎসর ধরে কবির জীবনী ও সাহিত্য নিয়ে কাজ করে চলেছি এবং আজও তা চলছে। আমার এই কাজে সহায়তালাভের জন্য বিশ্বভারতী-কর্তৃপক্ষ ১৯৬৮ সাল থেকে রবীন্দ্রভবনের দুই তরুণ শ্রীমান প্রবীরকুমার দেবনাথ ও শ্রীমান দিলীপকুমার দত্তকে নিয়ে কাজ করার বিশেষ সুযোগ আমাকে দিয়েছেন। বলাবাহুল্য, সহায়তা-দানের মাধ্যমে শ্রীমানরা আমার গবেষণা-পদ্ধতি আয়ত্ত করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলেছেন। আমার এই বৃদ্ধবয়সে সহায়ক-দ্বয় ব্যতীত কাজ করা সম্ভব নয়—বিশ্বভারতীর নিকট এজন্য আমি কৃতজ্ঞ।

আজ এই পুণ্যদিবসে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে একটা কথা সবিনয়ে বলতে চাই। আমার যা-কিছু ধন-মান তা রবীন্দ্র-নাথকে নিয়েই—এও জানি ধন-মান কখনও সঙ্গে যাবে না। তাই আমার ও পরিবারের সকলের একান্ত ইচ্ছা যে আমার সঞ্চিত ধনের কিছু বিশ্বভারতীর হাতে সমর্পিত হোক্। এই অর্থ মাত্র দশ হাজার টাকা—এই টাকার বার্ষিক আয় থেকে প্রতি বৎসর দশটি পুস্তক-পুরস্কার প্রদান করার অনুরোধ জানাই। এই পুরস্কারে রবীন্দ্রনাথ-রচিত ও রবীন্দ্রনাথ-সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রদান করা হবে—এই আমার ইচ্ছা। আগামী ১১ই শ্রাবণ (২৭শে জুলাই) বিশ্বভারতী থেকে আমার অবসরগ্রহণের বিশ বৎসর পূর্ণ হবে, ঐদিনে পুরস্কারগুলি প্রদত্ত হলে সুখী হবো। বিশ্বভারতী বিদ্যাভবন, শিক্ষাভবন ও পাঠভবনের ছাত্রছাত্রীরা

১২

হবেন এই পুরস্কার-প্রাপক—কে বা কারা পাবেন ও কিভাবে পাবেন সেসব ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ করবেন। এই সামান্য দান গ্রহণ করে বিশ্বভারতী আমাকে ধন্য করুন, এই আমার প্রার্থনা।

আমার কথা শেষ করার আগে একটা কথাই বলবো—'ফাঁকি দিয়ে কোনো মহৎ কাজ হয় না' একথা আমি বরাবরই মেনে চলবার চেষ্টা করছি। এখানে সমবেত তরুণদের বিশেষভাবে বলছি, তোমরাও একথাটা মনে রেখো। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে গেলে নিখাদ-পরিশ্রম করতে হবে ফাঁকির আশ্রয় ত্যাগ করে। যদি তোমাদের কারও আগ্রহ থাকে, তবে আমাদের কর্ম-কেন্দ্রে গিয়ে আমাদের কর্মধারার সঙ্গে পরিচিত হতে পারো।

আমার এই জীবন-সায়াহ্নে আশ্রমিক সংঘের পক্ষ থেকে তোমরা যে সম্মান প্রদান করলে তাতে আমি অভিভূত—আন্তরিকভাবে তোমাদের দান আমি গ্রহণ করলাম। আশাকরি, তোমাদের মধ্যে হয়তো অনেকেই ভাবীকালে সেদিন-কার আশ্রমিক সংঘের কাছ থেকে সম্মান পাবে এই শুভদিনে। তোমাদের কল্যাণ হোক্—এই প্রার্থনা করি।

৭ই পৌষ, ১৩৮০
বোলপুর-শান্তিনিকেতন

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

জীবনের বর্ষপঞ্জী

১৮৯২॥১২৯৯

নদীয়া জেলার রানাঘাটে ২৭শে জুলাই জন্ম। পিতা নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং মাতা গিরিবালা দেবী।

১৯০৬॥১৩১৩

রানাঘাট পালচৌধুরী বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হবার পর গিরিধি আগমন ও সেখানকার বিদ্যালয়ে শিক্ষারম্ভ।

১৯০৭॥১৩১৪

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষে ৭ই আগস্টে অনুষ্ঠিত সভায় যোগদান করার জন্য গিরিধি বিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত।

১৯০৮॥১৩১৫

কলিকাতায় জাতীয় শিক্ষাপরিষদ-প্রবর্তিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় পঞ্চমস্থান অধিকার ও মাসিক ১০৲ টাকা বৃত্তিলাভ। ১৯০৮ অক্টোবরে পিতার মৃত্যু।

১৯০৯॥১৩১৬

কলিকাতায় স্বাস্থ্যহানির জন্য কলেজ ত্যাগ। নভেম্বর মাসে শান্তি-নিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক হিমাংশুপ্রকাশ রায়ের সহায়তায় আশ্রমে আগমন। ছয় মাস পরে

১৯১০॥১৩১৭

মাসিক ১৫৲ টাকা বেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক নিযুক্ত ১৯১০ জুন মাসে। আঠারো বৎসর পূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক শান্তিনিকেতন মন্দিরে ভাষণদান (পূর্ণ)। পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ।

১৯১২॥১৩১৯

গ্রন্থ : প্রাচীন ইতিহাসের গল্প। ঢাকা (উয়ারী)। যদুনাথ সরকারের ভূমিকা-সম্বলিত।

১৯১৭-১৮॥১৩২৫

কলিকাতা সিটি কলেজের গ্রন্থাগারিক। 'বিচিত্রা' ক্লাবের সহিত যুক্ত।

১৯১৮॥১৩২৫

পূজাবকাশের পর পুনরায় শান্তিনিকেতন আগমন—পাঠভবনের শিক্ষকতা ও গ্রন্থাগারের কার্যভার গ্রহণ।

১৯১৯॥১৩২৬

২৭শে মে পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণের চতুর্থ কন্যা শ্রীমতী সুধাময়ী দেবীর সংগে বিবাহ।

১৯২০॥১৩২৭

গুরুপত্নীর বাড়িতে বাস।

১৯২১॥১৩২৮

বিশ্বভারতীর প্রথম বিদেশী 'অভ্যাগত-অধ্যাপক' সিলভ্যাঁ লেভির নিকট চীনা ও তিব্বতী ভাষা শিক্ষা ও গবেষণা।

গ্রন্থ : ভারত পরিচয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ভূমিকা-সম্বলিত। বেংগল বুক কোম্পানী।

১৯২৫॥১৩৩২

বিশ্বভারতীর বিদেশী অধ্যাপক ইতালির জোসেফ তুচ্চির নিকট চীনা ভাষায় কুং ফুৎসুর গ্রন্থ পাঠ।

গ্রন্থ : ভারতের জাতীয় আন্দোলন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা-সম্বলিত। বরোদা এজেন্সী।

১৯২৬॥১৩৩৩

বিশ্বভারতী শিক্ষাভবনের অধ্যাপক। এই পদে ১৯৪১ পর্যন্ত ছিলেন পাঠভবনের ক্লাসগ্রহণ গ্রন্থাগারের কাজের সাথে। বংগীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সভাপতি।

১৯২৭॥১৩৩৪

ফেব্রুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথের সংগে ভরতপুর, জয়পুর ও আমেদাবাদ ভ্রমণ। এই বৎসরের জুলাই মাস থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষাপরিষদে 'হেমচন্দ্র বসুমল্লিক' অধ্যাপক পদে নিযুক্ত এবং বৃহত্তর ভারতে হিন্দু এবং বৌদ্ধ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে ধারাবাহিক ভাষণদান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে বৃহত্তর ভারত বিষয়ক বক্তৃতা। সভাপতি উপাচার্য যদুনাথ সরকার। সপরিবার শিলং ভ্রমণ।

গ্রন্থ : ভারত পরিচয়। দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত। বরদা এজেন্সী কলিকাতা।

১৯২৮ ॥ ১৩৩৫

প্রো-ভাইস্ চান্সেলর ডাঃ ধ্রুব-র আমন্ত্রণে ৩০-৩১শে জানুয়ারি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ১লা ফেব্রুয়ারি কাশী বিদ্যাপীঠে বৃহত্তর ভারত সম্পর্কে ভাষণদান। অধ্যাপক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি।

১৯৩১ ॥ ১৩৩৮

গ্রন্থ : ১. ইতিহাসের দপ্তর—পুরানো ভারত। বুক কোম্পানী। ২. বর্ষপঞ্জী (রবীন্দ্রনাথের জীবনের সত্তর বৎসরের প্রধান ঘটনা ও প্রকাশিত গ্রন্থের কালানুক্রমিক তালিকা)। ৩. ইনডিয়ান লিটারেচার ইন চায়না অ্যান্ড দি ফার ইস্ট। কবির সত্তর বৎসর বয়সে গ্রন্থখানি উৎসর্গীত হয়। গ্রন্থখানি প্রকাশে ঘনশ্যামদাস বিড়লা কর্তৃক পাঁচশ টাকা প্রদান।

১৯৩২ ॥ ১৩৩৯

গ্রন্থ : রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী (রবীন্দ্রনাথের রচিত গ্রন্থের কালানুক্রমিক প্রকাশের প্রথম প্রয়াস)।

১৯৩৩ ॥ ১৩৪০

গ্রন্থ : রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক। প্রথম খণ্ড। বিশ্ব-ভারতী। ব্রহ্মদেশ ভ্রমণ। রেংগুনে জ্যেষ্ঠভ্রাতার সহিত কুমারকে গ্রন্থ উৎসর্গ। রেংগুন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যার বিশিষ্ট ইংরেজ অধ্যাপক ডঃ লিউসের (Luce) সংগে পরিচয়।

১৯৩৫ ॥ ১৩৪২

গ্রন্থ : বাংলা দশমিক বর্গীকরণ (মেলভিল ডিউই প্রবর্তিত ডেসিমাল ক্লাসিফিকেসন অনুসারে বাংলা লাইব্রেরিগ্রন্থ বর্গীকরণ পদ্ধতি)।

১৯৩৬ ॥ ১৩৪৩

শ্রীনিকেতনের 'লোকশিক্ষা সংসদ' স্থাপিত হলে প্রথম সহ-সম্পাদক। বেংগল এডুকেশন উইক-এ বক্তৃতা (৩১ জানুয়ারি)।
গ্রন্থ : ১. বংগপরিচয়। প্রথম খণ্ড। ওরিয়েণ্টাল প্রেস। ২. রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক। দ্বিতীয় খণ্ড। বিশ্বভারতী।

১৯৪০ ॥ ১৩৪৭

গ্রন্থ : জ্ঞান-ভারতী বা সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ। রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সম্বলিত। ন্যাশনাল লিটারেচার।

১৯৪১॥ ১৩৪৮

পাবনা আনন্দগোবিন্দ পাঠাগারের পঞ্চাশবর্ষ-পূর্তি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব।

১৯৪২॥ ১৩৪৯

গ্রন্থ : ১. জ্ঞানভারতী বা সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ। দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম ভাগ। ২. বঙ্গপরিচয়। দ্বিতীয় খণ্ড।

১৯৪৩॥ ১৩৫০

বোলপুর তালতোড় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টরূপে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করায় সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত।

১৯৪৬॥ ১৩৫৩

বরোদায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে বিভিন্ন আলোচনায় অংশ গ্রহণ।

গ্রন্থ : রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক। প্রথম খণ্ড। পরিবর্ধিত সংস্করণ। বৈশাখ ১৩৫৩।

১৯৪৮॥ ১৩৫৫

২৪শে অক্টোবর প্রয়াগে ভাষণ।

এইসময় খ্যাতনামা হিন্দী সাহিত্যিক শ্রীরাহুল সাংকৃত্যায়নের সঙ্গে পরিচয়। পরে প্রভাতকুমারের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁর 'বৌদ্ধসংস্কৃতি' হিন্দী-গ্রন্থখানি "বিশ্বভারতীস্থ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়েষু"কে উৎসর্গ করেন।

২৮শে তারিখে লক্ষ্ণৌতে ভাষণ দান করেন।

গ্রন্থ : রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক। দ্বিতীয় খণ্ড। পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৫৫ মাঘ। প্রথম প্রকাশ ১৩৪৩।

১৯৫১॥ ১৩৫৮

১০-১৮ মে ইন্দোরে সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে যোগদান ও সংস্কৃত সাহিত্য বর্গীকরণ সম্পর্কে আলোচনা।

১৯৫২॥ ১৩৫৯

হায়দ্রাবাদে সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে যোগদান এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণ।

গ্রন্থ : রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক। তৃতীয় খণ্ড। বিশ্বভারতী।

১৯৫৩॥ ১৩৬০

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'সরোজিনী বসু' স্বর্ণপদক লাভ।

১৯৫৪ ॥ ১৩৬১

জুলাই মাসে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ।

১৯৫৬ ॥ ১৩৬৩

গ্রন্থ : রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক। চতুর্থ খণ্ড।

১৯৫৭ ॥ ১৩৬৪

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক 'রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক' গ্রন্থের জন্য 'রবীন্দ্রপুরস্কার' প্রাপ্তি। এই বৎসর ৮ই মে (২৫শে বৈশাখ) কলিকাতা 'রবীন্দ্রমেলা'র উদ্যোক্তাবৃন্দ-কর্তৃক সংবর্ধিত—সভাপতি তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। অক্টোবর মাসে বারাণসী নাগরিণী প্রচারিণী সভায় এবং গার্লস কলেজে এবং লক্ষ্ণৌ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ছাত্রসভায় বক্তৃতা প্রদান।

১৯৫৮ ॥ ১৩৬৫

গ্রন্থ : নবজ্ঞান-ভারতী (পৃথিবীর ভৌগোলিক নামের পরিচয় সহ তালিকা)।

১৯৫৯ ॥ ১৩৬৬

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রবীন্দ্রনাথের চেনাশোনা মানুষ' সম্বন্ধে ৯ই, ১০ই ও ১১ই ফেব্রুয়ারি 'লীলা' বক্তৃতা প্রদান।

গ্রন্থ : ১. বাংলা-গ্রন্থ বর্গীকরণ। ওরিয়েন্ট বুক কোং। ২. রবীন্দ্র জীবন কথা। বিশ্বভারতী।

১৯৬০ ॥ ১৩৬৭

৮ই মে শিলিগুড়িতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-গৃহের শিলান্যাস করেন।

গ্রন্থ : ১. রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক। প্রথম খণ্ড। তৃতীয় সংস্করণ। পৌষ ১৩৬৭। ২. ভারতে জাতীয় আন্দোলন। দ্বিতীয় সংস্করণ।

১৯৬১ ॥ ১৩৬৮

এই বৎসর রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে ভারতবর্ষব্যাপী অনুষ্ঠিত সভাসমিতির বহুস্থানে ভাষণদান। তন্মধ্যে দিল্লী Peace Festival-এর 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' (২২শে মার্চ) বক্তৃতা উল্লেখযোগ্য। এই বৎসর ৬ই মে বর্ধমানে রবীন্দ্রসদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১১ই নভেম্বর ভারত সরকার ও সাহিত্য আকাডেমী প্রদত্ত 'রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী' পুরস্কার লাভ। এই নভেম্বর

মাসেই জয়পুর ও আজমীরে ললিতকলা আকাদেমীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় ভাষণদান।

গ্রন্থ : ১. রবি-কথা (আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত ছয়টি ভাষণ)। ২. রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক। দ্বিতীয় খণ্ড। পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ আশ্বিন ১৩৬৮। প্রথম প্রকাশ ১৩৪৩। ৩. রবীন্দ্র জীবনকথা পরিবর্ধিত সংস্করণ। ৪. রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক। তৃতীয় খণ্ড। দ্বিতীয় সংস্করণ।

১৯৬২ ॥ ১৩৬৯

'সোভিয়েত্ আকাদেমী অফ্ সায়েন্স' কর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে পক্ষ-কালের জন্য অক্টোবর মাসে রাশিয়া ভ্রমণ (ভ্রমণকাহিনীর জন্য দ্রষ্টব্য 'সোভিয়েত্ সফর' ১৯৬৫)।

গ্রন্থ : ১. রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জী। জিজ্ঞাসা। ২. শান্তিনিকেতন-বিশ্ব-ভারতী (প্রথম খণ্ড)। বুকল্যাণ্ড।

১৯৬৩ ॥ ১৩৭০

ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ'-বক্তৃতায় 'তথ্য ও তত্ত্বের সম্বন্ধ নির্ণয়' বিষয়ে ভাষণদান।

গ্রন্থ : রবীন্দ্রনাথের চেনাশোনা মানুষ (১৯৫৯ সালে 'লীলা' বক্তৃতা)।

১৯৬৪ ॥ ১৩৭১

এপ্রিল মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে 'বিদ্যাসাগর বক্তৃতা' প্রদান (দ্র. 'রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য'। বিশ্বভারতী ১৯৭২)।

গ্রন্থ : রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক। চতুর্থ খণ্ড পরিবর্ধিত সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৩৭১।

১৯৬৫ ॥ ১৩৭২

ডিসেম্বর মাসে বিশ্বভারতী সমাবর্তন উৎসবে আচার্য প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী কর্তৃক 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত।

গ্রন্থ : ১. সোভিয়েত সফর। রাইটার্স ফোরাম। ২. ভারতে জাতীয় আন্দোলন। তৃতীয় সংস্করণ (পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত)। ১লা জানুয়ারি ১৯৬৫।

১৯৬৬ ॥ ১৩৭৩

রানাঘাট পৌরসভার শতবর্ষ পূর্তি উৎসবে সভাপতিত্ব।

গ্রন্থ : পৃথিবীর ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)। প্রথম খণ্ড।

১৯৬৭ ॥ ১৩৭৪

কথাসাহিত্যে প্রভাতকুমারের জীবনের ও রচনার বর্ষপঞ্জী প্রকাশিত (শ্রাবণ ১৩৭৪)।

১৯৬৯ ॥ ১৩৭৬

শান্তিনিকেতন মন্দিরে অনুষ্ঠিত মাঘোৎসবে আচার্যরূপে ভাষণদান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে 'বাঙ্‌লায় ধর্মসাহিত্য' বিষয়ে 'শ্রীযোগিন্দ্রমোহিনী' বক্তৃতা দান।

গ্রন্থ : রবীন্দ্রনাথের গান (কালানুক্রমিক সূচী)। প্রথম খণ্ড।

১৯৭০ ॥ ১৩৭৭

গ্রন্থ : রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক। প্রথম খণ্ড। চতুর্থ সংস্করণ।

১৯৭১ ॥ ১৩৭৮

এপ্রিল মাসে দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আকাশবাণী দিল্লী থেকে ইংরেজি-কথিকা সম্প্রচারিত।

বিশ্বভারতীর পঞ্চাশ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত বিশেষ ডাকটিকিট বিক্রয়ের উদ্বোধন করেন।

১৯৭২ ॥ ১৩৭৯

গ্রন্থ : রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য (কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'বিদ্যাসাগর বক্তৃতা' ১৯৬৪)।

১৯৭৩ ॥ ১৩৮০

২১শে এপ্রিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ডি. লিট্' উপাধিতে ভূষিত। ২৭শে এপ্রিল 'রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি' কর্তৃক মানপত্র ও তিন হাজার টাকা প্রদান। ২৭শে জুলাই ৮২ বৎসরে পদার্পণ উপলক্ষে বিশ্বভারতী পাঠভবন কর্তৃক জন্ম-উৎসব পালন। বীরভূম বর্ধমান ডেলী প্যাসেঞ্জারস্ এসোসিয়েশন, লুপ সেক্‌শন-এর প্রথম সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ, ২রা ডিসেম্বর, ১৯৭৩।

প্রকাশক
কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ
শান্তিনিকেতন বীরভূম

মুদ্রক
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাঃ লিঃ
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

সুমিতা বসু

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে

এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছি। মাত্র সাতটা বাজে, হাতে অনেক সময়, আমার ফ্লাইট আজ দেরি করছে, ছাড়বে রাত ৯টা কুড়িতে। সময়টা নষ্ট না করে ব্যাগ থেকে একটা বই বার করে পড়া যাক। যা ভাবা তাই কাজ। আসার সময় তাড়াহুড়োয় দুনিয়ার জিনিসপত্র ঠাসাঠাসি করে ঢুকিয়েছি ! পেটমোটা ব্যাগ খুলতেই কম্পিউটার চার্জার থেকে শুরু করে ডালিমের কৌটো, Tylenol – আরও আরও কত না জিনিস, নির্লজ্জের মতো হুড়মুড় করে বেরিয়ে যে যার মতো গড়াগড়ি দিতে লাগল। পাসপোর্ট-এর কাগজপত্র কোনোমতে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে, বিব্রত হয়ে বাকি জিনিসপত্র তুলতে লাগলাম। দেখলাম পাশের মহিলাও নিজে থেকেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে খুব যত্ন করে সব তুলে রাখছে। আমার উদ্ভ্রান্তের মতো অবস্থা দেখে, চোখাচোখি হতে নির্মল এক হাসি দিয়ে বলল, It happens. No worries.

লজ্জিত হয়ে সব গোছানোর পর অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললাম, অনেক ধন্যবাদ, আমার নাম ... চলেছ কোথায় ?

একটু ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল, হ্যালো, আমার নাম রেনেটা। হিউস্টনে এসেছিলাম এক সপ্তাহের জন্য, আন্তর্জাতিক শিক্ষক সমাবেশে। আজ চল্লিশ বছর আমি সান্টিয়াগোতে হাইস্কুলে পড়াই। এখন ফিরছি নিজের দেশে – চিলিতে। আর তুমি ?

– হিউস্টন আমার বড় প্রিয় কিন্তু পাতানো ঘর, এখানে ব্যাংকে কাজ করি বহুদিন। এখন চলেছি নিজের মাতৃভূমি ভারতবর্ষে, কলকাতায়। বলতে পারো নিজের দেশেই, এখানে আমি পরবাসী।

– ও কলকাতা ? My God! তুমি তাহলে টেগোরের দেশের লোক। গলায় টের পেলাম এক অদ্ভুত উত্তেজনা ও আন্তরিকতা।

– তুমি টেগোর জানো ? কলকাতা জানো ? আনন্দে আটখানা হয়ে প্রশ্ন করলাম।

– জানবো না ? টেগোরের কবিতা আমাদের পাঠ্যসূচিতে আছে। এছাড়া তাঁর স্কুলের যে আদর্শ – প্রকৃতির মধ্যে রেখে ও একাত্ম করে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়ানো, তা আজ আমাদের কাছে এক পরম অনুপ্রেরণা। আমি নিজেও এই নিয়ে বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি। পুরোপুরি পারিনি ঠিকই, কিন্তু আমরা নিশ্চিত বিশ্বাস করি যে, প্রাকৃতিক পরিবেশেই শিশুমন সব থেকে বেশি আনন্দিত প্রস্ফুটিত হয়। তাঁরই আমন্ত্রণে, টেগোরের শান্তিনিকেতনের স্কুলে তো মারিয়া মোন্টেসরি একদিন নিজেও গিয়েছিলেন।

রেনেটা অত্যন্ত উৎসাহে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আরো অনেক কথা বলতে লাগল। বলল, বিখ্যাত স্প্যানিশ কবি হুয়ান রামোন হিমিনেজ (Juan Ramon Jimenez) ও সেই সময় তাঁর তখনকার ভাবী স্ত্রী জেনোবিয়া ক্যাম্পরুবি (Zenobia Camprubi) ১৯১৩ সালেই গীতাঞ্জলি অনুবাদের কাজ শুরু করেন স্প্যানিশ ভাষায়। সেই সময় থেকেই একটু একটু করে টেগোর পরিচিত হতে থাকেন। একটু থেমে রেনেটা আবার শুরু করল – জানো তো, রামোন হিমিনেজ সাহিত্যে নোবেল পান ১৯৫৬ সালে, কিন্তু টেগোর পান ১৯১৩ তে। তাছাড়া পাবলো নেরুদার রবীন্দ্রপ্রীতি তো সকলেরই জানা। নেরুদা নোবেল পেলেন ১৯৭১এ । তাই আমাদের দেশে শিক্ষিত মহলে টেগোর কিন্তু মোটেই অপরিচিত নাম নন।

রেনেটা একবার ঘড়িটা চট করে দেখে নিল, তারপর একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বলতে থাকল, নেরুদার বিখ্যাত বই – '20 Love Poems'-এর ১৬ নম্বর কবিতাটি টেগোরেরই একটি কবিতার অনুসরণে – কথা বলতে বলতেই Google করে

কবিতাটি বার করে সুরেলা গলায় পড়তে শুরু করে দিল –

In my sky at twilight you are like a cloud
and your form and color are the way I love them.
You are mine, mine, woman with sweet lips
and in your life my infinite dreams live…

You are mine, mine, I go shouting it to the afternoon's
wind, and the wind hauls on my widowed voice.
Huntress of the depths of my eyes, you plunder
stills your nocturnal regard as though it were water…

রেনেটা পড়ে যাচ্ছে আর আমার কানের কাছে বাজছে সেই চিরশ্রুত ও চিরন্তন প্রেমের গান, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের গলায় ... তুমি আমারি, তুমি আমারি ...

তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা তুমি আমার নিভৃত সাধনা,
মম বিজনগগনবিহারী
আমি আমার মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা –
তুমি আমারি, তুমি আমারি, মম বিজনজীবনবিহারী ...

বুঝলাম, অজস্র বাঙালী প্রেমিকের মতো অজস্র স্প্যানিশ প্রেমিকও, You are mine, mine, You are mine, mine, বলে প্রেম নিবেদন করে আসছে অনেক দশক ধরেই।

রেনেটার কথা শুনতে শুনতে আমিও আনন্দে বারবার হারিয়ে যাচ্ছিলাম, মাথা নত করে যাঁর কাছে প্রতি প্রাতে সূর্য প্রণামের মতো বলতে ইচ্ছে করে, 'হে পূর্ণ তবে চরণের কাছে, যাহা কিছু সব আছে আছে আছে' ...

দক্ষিণ আমেরিকায় টেগোরের প্রভাব সম্বন্ধে কিছু কিছু পড়া থাকলেও, এত সমস্ত আমার জানা ছিল না। জানতাম, ১৯২৪ সালে পেরু সরকারের আমন্ত্রণে অসুস্থতার কারণে পেরুতে তাঁর আর যাওয়া হয়নি, আর্জেন্টিনাতেই আটকে যান। সেখানে কবির সঙ্গে দেখা হয় ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর, কবির 'বিজয়া'।

বারবার আমন্ত্রণ করা সত্ত্বেও ওকাম্পোর কিন্তু কোনোদিন শান্তিনিকেতনে আসা হয়নি। তবে ওকাম্পোর আগ্রহে ও উৎসাহে রবীন্দ্রনাথের শিল্পচর্চার প্রকাশ ও প্রচার। রবীন্দ্রনাথের শিল্প প্রসঙ্গ তুলতেই দেখলাম, রেনেটা সে খবরও রাখে। আজকাল অবশ্য Google দাদার কল্যাণে, খবর রাখতে চাইলে রাখা যায় ! রবীন্দ্রনাথই প্রথম ভারতীয় ১৯৩০ সালে প্যারিসে যাঁর একক শিল্পপ্রদর্শন হয়েছিল। পরে সেই ৩০০টি শিল্পকলা বার্লিন হয়ে লন্ডন-এ যায়। দর্শক, শিল্প সমালোচকরা এক কথায় তাঁর তুলির টানকে অভূতপূর্ব ও অন্যরকম বলে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন তখন – এসব অনেকটাই আমাদের জানা কথা। অপরিচিতা বিদেশিনী রেনেটার মুখ থেকে কবির সার্ধ-শতবর্ষ পরে এয়ারপোর্টে বসে অনর্গল এসব কথা শুনে, সত্যি গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। অসম্ভব গর্ব হচ্ছিল। আমাদের রবীন্দ্রনাথ। ভারতীয় ঋষি বলেছেন, 'বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে', একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।

জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খন্ড ক্ষুদ্র করি –

এয়ারপোর্টের সেই এক ঘন্টায় আমার চোখ খুলে গেল। কথা বলতে বলতে রেনেটার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। আমি মুগ্ধ হয়ে শুনতে শুনতে শুধু মনে মনে আওড়াচ্ছিলাম তাঁরই কবিতা, গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজার মতো। কবির ভাষায়,

প্রবাস কোথাও নাহি রে নাহি রে
জনমে জনমে মরণে।
যাহা হই আমি তাই হয়ে রব
সে গৌরবের চরণে।

এই কবিতার শুরুতে আছে :

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।
দেশে দেশে মোর দেশ আছে,আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া।
পরবাসী আমি যে দুয়ারে চাই –
তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই,
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই
সন্ধান লব বুঝিয়া।
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়,
তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া।

উৎসর্গ/১৪

একটা প্রশ্ন আমায় বারবার ভাবায় – কতটা সত্যি করে আমরা হৃদয়ে অনুভব করি তাঁর গান ও কবিতা? কতটা ভাবি আজও তাঁর ভাব ও ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা ? আমাদের নিজেদের মধ্যেই কিছু কিছু মানুষের কাছে রবীন্দ্রসংগীত মানেই 'প্যানপ্যানানি', রবীন্দ্র-নাটক মানেই 'ওরে বাবা', রবীন্দ্রালোচনা মানেই 'একই কথার চর্বিত চর্বণ'। বাঙালী হয়ে মাতৃভাষাতে পড়তে পারি তাঁর রচনা – এটা যে কত বড় আশীর্বাদ, সেটা কি খেয়াল রাখি ? যেমন, আজ থেকে একশো বছর আগে ১৯২৩-২৪ সালে লেখা রক্তকরবীতে রাজা-নন্দিনীর কথোপকথনে, রাজার মুখ দিয়ে বলেছেন, ... 'নিজেকে গুপ্ত রেখে বিশ্বের বড়ো বড়ো মালখানার মোটা মোটা জিনিস চুরি করতে বসেছি। কিন্তু যে দান বিধাতার হাতের মুঠির মধ্যে ঢাকা, সেখানে তোমার চাঁপার কলির মতো আঙ্গুলটি যতটুকু পৌঁছয়, আমার সমস্ত দেহের জোর তার কাছ দিয়ে যায় না।' মুক্তধারার উক্তিতে আছে ... 'পৃথিবীতে কোনো একলা মানুষই এক নয়, সে অর্ধেক। আর-এক জনের সঙ্গে মিল হলে তবেই সে ঐক্য পায়' ... এই সব বাক্যের মধ্যে আজও কি এক অসম্ভব প্রাসঙ্গিকতা নেই ?

হয়তো আজকের এই অশান্ত আর হিংসাত্মক পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে, আরো বেশি করে আছে। অনাচার, বর্ণ ও জাতিবিদ্বেষ আজকের পৃথিবীতে আরো চূড়ান্ত। বারুদ আর গুলির নল ঘরে ঘরে আর সেগুলি অত্যন্ত সহজলভ্য মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষের হাতে, নইলে স্কুলে ঢুকে অবোধ শিশু হত্যা চলে কী করে বারবার ! কিন্তু রবীন্দ্র নাটক বিসর্জনের নায়ক জয়সিংহের মতো কোনো নির্ভীক তো এগিয়ে এসে বলছে না, এই হোক শেষ, আর রক্ত নয় !

... রাজরক্ত আছে দেহে।
এই রক্ত দিব। এই যেন শেষ রক্ত
হয় মাতা, এই রক্তে মিটে যেন
অনন্ত পিপাসা তোর! ...

নিশ্চিত ভাবে জানি ও মানি, বাংলা বা পৃথিবীর সাহিত্যে জ্ঞানী বিদগ্ধ লেখকের অন্ত নেই। কিন্তু যত সরে গেছি ততই যেন ফিরে ফিরে এসেছি রবীন্দ্রসাহিত্যে। কল্লোলের কবিরাও তো আন্দোলন করে বিরুদ্ধতা করেছিলেন একদিন – বলেছিলেন, সম্মুখে থাকুন বসি পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর ! কিন্তু আবার দিনান্তে কুলায়ে ফেরার মতোই তাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন দিগন্ত বিস্তৃত রবির ছটায়। তাঁকে পড়া-জানা-অনুভব না করলে নিজের মধ্যেই তো আত্মস্থ হওয়া যায় না।

সমীর সেনগুপ্ত তাঁর 'গানের পিছনে রবীন্দ্রনাথ' বইটিতে লিখেছেন, 'এই মানুষটির উত্তরাধিকারের একটি অর্বুদতম ভগ্নাংশও বাঙালী হিসেবে আমার ভিতরে বাহিত হয়ে এসেছে বলে, আমাকে নতুন করে ভাবতে হয়, আমি কি এই উত্তরাধিকারের যোগ্য ?' বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি, মনে মনে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম।

চিলি যাবার ফ্লাইটের ডাক এল। রেনেটা উঠে দাঁড়াল, আমাকে হাত ঝাঁকিয়ে বলল, তোমার ইমেইলটা রইল, নিশ্চই যোগাযোগ থাকবে। ইচ্ছে আছে, তিন চার বছর পর অবসর নিয়ে আমি ভারতবর্ষে বেড়াতে যাব। অবশ্যই শান্তিনিকেতনে যাব। গুরুদেবের জায়গা। কথা প্রসঙ্গে নানান আলোচনার মধ্যে, গান্ধীজী যে তাঁকে 'গুরুদেব' বলে ডাকতেন, কিছক্ষণ আগেই সেটা ওকে বলেছিলাম। দেখলাম, ঠিক মনে রেখে খুব সশ্রদ্ধ উচ্চারণে শব্দটি বলে, হাত নেড়ে ভিড়ের মধ্যে সে হারিয়ে গেল।

হারিয়ে গেল ? নিজের মনে মনে হাসলাম। রবীন্দ্রনাথকে বুকের মধ্যে ধরতে পারলে, 'তুমি কি কেবলি ছবি, শুধু পটে লিখা', তো আর হওয়া সম্ভব নয় ... তখন, হারানো কি সত্যি যায় ?

সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়

আনন্দগানের কথা

পৃথিবীর বয়স বাড়ছে। তার গাছপালার, পাহাড়ের, নদীর, চেনা অচেনা ভুবনের, বয়স বেড়েই চলেছে। পৃথিবী থেকে অনেকেই বিদায় নিয়েছেন, আরো অনেকে নেবেন। তেমনি এ পৃথিবীতে প্রতিমুহূর্তে জন্মগ্রহণ করছে বা ভবিষ্যতেও জন্ম নেবে কোটি কোটি প্রাণ। কীটপতঙ্গ, গাছপালা, মানব জীবনের কথা আমরা হয়ত জানতে পারি। অণু পরমাণুর মত বায়বীয় আপাতঅদৃশ্য প্রাণীর কোন সন্ধান রাখিনা। সেসব মিলিয়ে কত প্রাণ লয় পেল, কত জীব জন্ম নিল, তার সংবাদ অজানাই থেকে যায়।

জীবনের স্রোত বয়ে চলেছে অবিরাম। এই ওঠাপড়ার ঢেউ, এই অনন্ত জীবনপ্রবাহের মাঝে তাঁর বাণী ভেসে আসে। জগতের মূলে যে চালিকাশক্তি তাকে যেনামেই ডাকি না কেন তিনি আমাদের জীবনের এই ওঠাপড়ার পুতুলনাচের দড়িটি ধরে বসে আছেন একান্তে। সেই মহা শক্তির কথা স্বীকার না করে উপায় থাকেনা। যখন তার দড়িতে টান পড়ে, এগোনো পিছোনোর মত সচলতা জাগে। ছন্দ, সুর, তাল, মাত্রা কিছু না বুঝেই এগিয়ে যাই আমরা।

সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা, কবিরা, সেই অনন্ত সুরের উৎস খুঁজে চলেন সারাটি জীবন ধরে।

"যে আমি ওই ভেসে চলে কালের ঢেউয়ে আকাশতলে
ওরই পানে দেখছি আমি চেয়ে।"

কিংবা আরো স্পষ্ট করে . . .

"যে আমি যায় কেঁদে হেসে তাল দিতেছে মৃদঙ্গে সে,
অন্য আমি উঠতেছি গান গেয়ে।"

আমাদের এমন এক ঋষিতুল্য কবি ছিলেন, যাঁর কাব্যে, গীতে, প্রতিটি অক্ষরের তুলির টানে সেই অধরা বাণীটি থরথর ছিল। আমরা সকলেই মনে প্রাণে জানি সেই কবির নাম রবীন্দ্রনাথ। আমাদের আর এক কবি নজরুলের গানেও এই কথাটিই বেজেছে আবার, যেন প্রতিধ্বনির মত, "আমি যার নুপূরের ছন্দ, বেণুকার সুর, কে সেই সুন্দর কে ?" প্রাণের লক্ষ্য হল বিলুপ্তি। মহাভারতে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির বকরাক্ষসের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন মানুষ মরণশীল, কিন্তু সেকথা সে মনে রাখেনা।

যে কথাটি আমরা পাই তার গানে, সে ওই সাধারণ মানুষের কথা নয়। মৃত্যুর, বিনাশের চিরসত্য বাণীটি কত সহজে, কথার ছলে বলা আছে।

"তোরা যাবি রাজার পুরে অনেক দূরে,
তোদের রথের চাকার সুরে
আমার সাড়া পাই নি গো ।।
আমার এ যে গভীর জলে খেয়া বাওয়া,
হয়ত কখন্ নিসুত রাতে উঠবে হাওয়া।
আসবে মাঝি ওপার হতে উজান স্রোতে, . . ."

এসব কথার পরেও যুদ্ধের দামামা বাজে, শবদেহের সারি পার হতে হতে এগিয়ে চলে সৈনিকের দল। তাদের বেয়নেটে লেখা থাকে দুর্বল, পরাজিত শত্রুর নাম। শুধু যুদ্ধ নয় বন্যা, ভূমিকম্পে নিহত সহস্রাধিক মানুষের বিনষ্টিও আমাদের বিরত করেনা। আমাদের লোভে জর্জরিত, বিজয়ীর বাসনা কাতর হৃদয় বোঝেনা সামান্যের সাধনা করতে গিয়ে কোন অসামান্যের কৃপাদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হচ্ছি আমরা। কবির কথায়,

"আয় আয় রে পাগল, ভুলবি রে চল আপনাকে,
তোর একটুখানির আপনাকে।
তুই ফিরিস নে আর এই চাকাটার ঘুরপাকে।"

মাঝেমাঝে মনে হয় কতদিন আগে কত সহজে অনেক অনেক কথা বলেছিলেন কবি। সহজে যে উপলব্ধি হয়না, সে কথা কত সহজে বলেছেন তিনি। আমাদের মূঢ় দৃষ্টিতে যে বাসনার আচ্ছাদন, তাকে ভেদ করে সেই সত্যের সাক্ষাৎ পাইনি আমরা।

"কোন সুদূর হতে আমার মনোমাঝে
বাণীর ধারা বহে-আমার প্রাণে প্রাণে।
আমি কখন শুনি কখন শুনি না যে,
কখন কী যে কহে – আমার কানে কানে।।"

অনন্তের কিছু কথা আছে। আকাশে, বাতাসে, বনপল্লবে সেকথা নীরবে বাজে। সেই শ্রবণের বড় অভাব আমাদের এই সাধারণ জীবনচর্চায়। নিত্যদিনের সেই সাধনায় রত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।দিনযাপনের প্রতিটি মুহূর্তে সেই অলৌকিক সাধনা তাকে ঘিরে রেখেছিল।তিনি বলেছেন সেই উপলব্ধির কথা, তাঁর লেখায় অনায়াসে ধরা দিয়েছে সেই অশ্রুত রাগিনী, . . .

"গ্রহে তারকায় কিরণে কিরণে বাজিয়া উঠিছে রাগিণী
গীতগুঞ্জন কূজনকাকলি আকুলি উঠিছে শ্রবণে।"

কিংবা

"মধুর মধুর ধ্বনি বাজে
হৃদয়কমলবনমাঝে ।।"

# # #

এতকিছুর পরেও প্রতিদিনের পথচলার মাঝে যে অপার আনন্দের ভান্ডারখানি উন্মুক্ত করে রাখা আছে, তার সন্ধানে তিনি কখনও ক্লান্ত হননি।নিজের হৃদয়নিকেতনের চাবিকাঠিটি অক্লেশে তুলে দিয়েছেন অপটু, আনাড়ি হাতে। বিশ্বের রঙের ভাঁড়ার থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন রঙ, মুঠোয় ভরেছেন সেই আবির অন্যের হৃদয় রাঙিয়ে দেওয়ার জন্য।

"আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে . . .,
দিনরজনী কত অমৃতরস উথলি যায় অনন্ত গসনে।
পান করে রবি শশী অঞ্জলি ভরিয়া –
সদা দীপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি –
নিত্য পূর্ণ ধরা জীবনে কিরণে।।"

শুধু গানে নয়, শুধু কবিতায় নয়, কখনও বা প্রবন্ধে, নাটকে, উপন্যাসে, মানে সাহিত্যের যে কোন শাখায় নিজের এই উপলব্ধিকে উজাড় করে দিয়েছেন তিনি। কোন সভায় তাঁর বলা ভাষণেও ধরা পড়েছে সেই অমৃত, সেই আনন্দের প্রবহমানতার কথা।

"আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।"

এই শেষের কথাটিতেই তার বিশ্বাস ধরা পড়েছে। জরা, মৃত্যু,ব্যধি কবলিত যে মানবজীবন, যে জীবনে আশার সঙ্গে নিরাশার নিত্য দ্বন্দ্ব, সেই জীবনেও তিনি অমৃত সন্ধান করেন, আনন্দধারায় ধৌত হয় তাঁর পরমাত্মা।

"হেরি তব বিমলমুখভাতি দূর হল গহন দুখরাতি।"

এই আনন্দ কিন্তু সুখের মত তাৎক্ষণিক নয়। এর ব্যাপ্তি ভুবনময়, কিন্তু উৎস তাঁর গভীর অন্তস্থলে। দুঃখের অভিঘাতে যখন তাঁর হৃদয়ে ঝড় উঠেছে, তখনও সেই আনন্দ তিনি বিস্মৃত হননি। অক্লেশে বলেছেন,

"আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরানসখা বন্ধু হে আমার।।"

সন্তান বিয়োগব্যথায় কাতর কবি দেখেছেন চন্দ্রমার আলোকিত রূপ। অনুভব করেছেন ওই চাঁদের আলো প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করে বলছে, কোথাও কিছু কম পড়েনি। যা তিনি হারিয়েছেন তা নিতান্তই ব্যক্তিগত, যা তিনি পেলেন তা অনন্তের আনন্দভাগ। প্রকৃতির মায়াচ্ছন্নতার বেড়াজালে বিশ্বভুবনের সর্বব্যাপী আনন্দধারায় ডুব দিয়ে আবার সেই অক্ষয় প্রাণরস অর্জন করেছেন অক্লেশে।

আজকের এই ধাবমান পৃথিবীর যাবতীয় পাওয়া না পাওয়ার উর্ধ্বে এই প্রাপ্তির বোধ। কোন ক্ষুদ্র আসক্তি, দান প্রতিদানের জটিল অঙ্ক একে ছুঁতে পারেনা। কবিগুরুর সব কথার আড়ালেই তো রয়েছে সেই উচ্চচূড়ায় আসীন অমৃতসন্ধানী চেতনা। ভারী অদ্ভুত লাগে একথা ভেবে কত অনায়াসে এই অমৃতসাধনার সাথে তিনি স্থুল পৃথিবীকেও ওই ত্যাগ তিতিক্ষার কঠিন মন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন। সাহিত্যের সর্ব্বোচ্চ চূড়ার প্রাপ্তিকে যখন অনায়াসে তিনি বিলিয়ে দেন তার বিশ্বভারতীর কর্মকান্ডে, তখন তাঁর চারপাশে তিনি জড়ো করেছিলেন বেশ কিছু নক্ষত্রপ্রতিম মানুষকে। যাঁরা সর্বকালের প্রেক্ষিতে বিশেষ ধরণের গুণসম্পন্ন ছিলেন। তাঁরাও স্বচ্ছন্দে সেই কর্মযজ্ঞের ধারায় নিজেকে সঁপে দিতে দ্বিধা করেননি। জাগতিক প্রাপ্তির ভান্ডে কিছু কম পড়লেও, আনন্দধারায় সিক্ত হতে তাদের বাধেনি। আর অদ্ভুতভাবে সূর্যের চারপাশের নক্ষত্রের মত তাদের উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়েছে পরিমন্ডল। তিনি বারবার প্রমাণ করেছেন, ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা দিতে হলে, সর্বপ্রথম সেই মন্ত্রকে নিজেকেই আত্মস্থ করতে হবে।

এই পৃথিবীর খেলায় আছে পাওয়া আর না পাওয়ার দ্বন্দ্ব। কবির হৃদয়ের কোথাও সেই ক্ষুদ্র চাওয়া পাওয়ার বাসা ছিল না। অনেক খানি চাইলে একটুখানি পাওয়া যায়, একথাটি আমাদেরও জানা আছে। তবে সে জানাটির সঙ্গে কবির কথা মেলেনা। তিনি বলছেন,

"যে চাওয়াটি গোপন তাহার কথা যে নাই।।"

আবার করে যেন মনে করিয়েছেন,

"একটি চাওয়া ভিতর হতে ফুটবে তোমার ভোর-আলোতে
প্রাণের স্রোতে –
অন্তরে সেই গভীর আশা বয়ে বেড়াই।"

রবীন্দ্রসাহিত্যের যে সুবিশাল ব্যাপ্তি তা একজীবনে গ্রহণ ও ধারণের শক্তি খুব কম মানুষের আছে। তবে কবির ভাবনার মূলে যে দর্শন তা তিনি বারেবারে তাঁর সব লেখায় প্রকাশ করেছেন। জগৎ ও জীবনের আনন্দধারাটির উৎস

হতে আহরিত মধুভান্ডের স্বাদে আমাদের কখনওই বঞ্চিত করেননি। তবু আমরা তার সম্যক ধারণা পাইনি। আজকের পৃথিবী শিল্পজগতের যে কুটিল জটিল খেলায় মেতে আছে, যে স্বার্থবুদ্ধির তাড়নায় উদভ্রান্তের মত আচরণ করছে, সে সব নিমেষে স্তব্ধ করে দেবার মত চেতনা তিনি বারেবারে বিতরণ করেছেন, আমরা গ্রহণ করতে পারিনি।

আমাদের ঘরের মানুষ, আমাদের প্রাণের মানুষ, সেই কবিকে তাই বারেবারেই স্মরণ করতে হবে। গঙ্গাজলেই গঙ্গাপুজোর মত সেই পুজোর মন্ত্র হবে তারই গান, তারই কবিতা। তাঁর সাহিত্যচর্চার সেই পথেই হবে আমাদের মত আত্মবিস্মৃত বাঙালির সঠিক উত্তরণ। আবার উচ্চারণ করি তাঁর গানের কিছু অমৃত বাণী।

"জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দগান বাজে, সে গান কবে গভীর রবে বাজিবে হিয়া – মাঝে ।।
বাতাস জল আকাশ আলো সবারে কবে বাসিব ভালো,
হৃদয়সভা জুড়িয়া তারা বসিবে নানা সাজে ।।
নয়ন দুটি মেলিলে কবে পরান হবে খুশি,
যে পথ দিয়া চলিয়া যাব সবারে যাব তুষি।"

# # #

রমা জোয়ারদার

রবিঠাকুর, তোমার জন্য

রাতের বেলা অন্ধকার, নির্জন রাস্তা ধরে একলা হেঁটে যাচ্ছিলাম। মনটা একদম ভালো নেই। আজ আমার সবকিছু হারিয়ে গেছে! শরীরে মনে অবসাদ, শুধু অবসাদ!

ভাবছিলাম, কি করি এখন? নিরুদ্দেশের পথে হাঁটতে-হাঁটতে, হাঁটতে-হাঁটতে অচেনা জগতে হারিয়ে যাব ? নাকি চোখ বন্ধ করে যে কোনো একটা ট্রেনে উঠে অনেক দূরে কোথাও চলে যাব – যেখানে কেউ আমাকে চিনতে পারবে না। অথবা, আরেকটা কাজ করতে পারি ! আমার কাছে অনেক ঘুমের ওষুধ জমানো আছে। এখনও এই কাঁধের ব্যাগটাতেই সেগুলো রাখা আছে। মুঠো ভরে সেগুলো একসাথে খেয়ে নিয়ে চিরকালের মতো এজন্মের পাট চুকিয়ে দিতে পারি !

শরীরে মনে এমন অবসাদ ছেয়ে গেছে যে আমার পা আর চলতে চাইছে না। পাশেই একটা পার্ক – সযত্নে লালিত নয়। শহরের শেষ প্রান্তে অযত্নে পরে থাকা পার্ক। কাছাকাছির বস্তির বাচ্চাগুলো খেলাধুলো করে। পথ চলতি দিন মজুররা কখনো পার্কের বড় বড় গাছের তলায় বসে বিশ্রাম নেয়। কয়েকটা কুকুর নিশ্চিন্তে শুয়ে ঘুমোয়। শৌখিন গাছ-টাছ কিছু নেই – ফুলগাছ তো নেই-ই। পার্কের ধারের দিকে কিছু আগাছার ছোট ছোট ঝোপ আছে। তবে, বহুদিন আগে লাগানো কিছু গাছ এখন অনেক বড় হয়ে ডালপালা ছড়িয়েছে। সেই গাছের ছায়ায় দুটো নড়বড়ে বেঞ্চ আছে। পার্কের দরজা বহুদিন আগে ভেঙে গেছে। এখন অবারিত দ্বার। এখানে চোর বা পুলিশের উৎপাত নেই। সাপ-খোপ থাকতে পারে! কিন্তু তাতে আমার কি ? আমি তো মরতেই চাইছি। অতএব আমি সটান গিয়ে পার্কের বেঞ্চিতে শুয়ে পড়লাম। বেঞ্চিটা যদিও শক্ত কাঠের এবং খড়খড়ে, তবু হাত-পা টান করে সেখানে শোয়া মাত্র খুব আরাম হল। বেঞ্চের একদিকে একটা ছাতিম গাছ, অন্যদিকে একটা নিম গাছ। দুটো গাছেরই ছায়া পড়ে বেঞ্চের উপরে। কিন্তু এখন তো রাত – ছায়ার প্রশ্ন নেই।

মাথার উপর বিরাট কালো আকাশ। আকাশে চাঁদ দেখা যাচ্ছে না। দু-চারটে তারা দূরে দূরে মিটমিট করছে। হঠাৎ আকাশ থেকে সার্চলাইটের মত একটা জোরালো আলো এসে পৌঁছাল ঠিক আমার বেঞ্চের সামনে। আর সেই আলোর পথ ধরে এক ছায়ামূর্তি আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। সাদা লম্বা দাড়ি,সাদা লম্বা চুল আর কালো আলখাল্লা-পরা সেই ছায়ামূর্তি আমার খুব চেনা। সেই কোন ছোটবেলা থেকে আমি তাকে দেখে আসছি। আমি তাঁর কবিতা বলেছি, তাঁর গান গেয়েছি। একটু বড় হতে তাঁর লেখা পড়েছি। তিনি যে আমাদের প্রাণের ঠাকুর – রবি ঠাকুর !

কিন্তু, তাঁকে সব সময় শুধু ছবিতেই দেখেছি! চোখের সামনে সশরীরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এই প্রথম দেখলাম। ধড়মড় করে উঠে বললাম – "গুরুদেব, আপনি ? এসময়! এখানে ?" আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে ওনাকে প্রণাম করতে গেলাম। উনি থাক, থাক বলে পিছিয়ে গেলেন! স্মিত হেসে বললেন – "আমি তো বহুদিন আগেই শরীরের বন্ধন হতে মুক্ত হয়েছি। তাই কল্পনার তরঙ্গে ছায়ারূপ ধরে ঘুরে বেড়াই সমস্ত বিশ্বলোকে। কিন্তু তোমার কি হয়েছে ? গৃহশয্যা ছেড়ে এখানে পড়ে আছ কেন ?"

রবিঠাকুরের কথায় আমার চোখে জল এসে গেল। বললাম – "আমার মত তুচ্ছ একটা মানুষের কথা জানতে চেয়েছেন আপনি, তাতেই আমি কৃতার্থ !"

আমাকে থামিয়ে দিয়ে ছায়ামূর্তি বললেন – "নিজেকে এমন তুচ্ছ ভাবছ কেন ?" আমাকে একবার দেখে নিয়ে নিজেই আবার বললেন – "এখন বুঝি তুমি আর কবিতা পড় না? কী সুন্দর গান গাইতে –

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে, হৃদয়ে রয়েছ গোপনে।

এখন সেসব গান আর গাও না? সেই কবিতাটা মনে আছে –

আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ
চুনি উঠল রাঙা হয়ে। আমি চোখ মেললাম আকাশে-
জ্বলে উঠল আলো পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর'-
সুন্দর হল সে।"

আমি মাথা নীচু করলাম। সত্যি তো কতদিন আমি শুধু রবি ঠাকুর কেন, কারো কবিতাই পড়িনি ! কতকাল কে জানে, গান না গেয়ে আমার গলার সুর হারিয়ে গেছে ! হাতজোড় করে বললাম – "গুরুদেব,আমি বড় সাধারণ মানুষ। দৈনন্দিন জীবনের টানা-পোড়েনে, চাওয়া-পাওয়ার হিসেব মেলাতে গিয়ে আমি আমার ছন্দ, সুর সব হারিয়ে ফেলেছি! অথচ যা পাওয়ার জন্য সেসব হারালাম, সেগুলো কিছুই ধরে রাখতে পারলাম না ! আমি আজ সর্বস্বান্ত, রিক্ত। আমার পাশে আজ আর কেউ নেই, কিছুই নেই। ঈশ্বর আমার সব কাছের মানুষদের টেনে নিয়ে গেছেন। কি নিয়ে বাঁচব আমি ? যারা আছে, তারা কেউ আমায় চায় না। আমি তাই মৃত্যুর পথ বেছে নিয়েছি!"

আমাকে থামিয়ে দিয়ে সেই ছায়ামানব গম্ভীর স্বরে বললেন – "মৃত্যু কি তোমার দাস যে তুমি ডাকলেই সে আসবে? তার যখন সময় হবে, তখনই সে আসবে। আর শোনো, জীবন থেকে পালানোর জন্য মৃত্যুকে চেও না। মৃত্যুর নিয়ন্ত্রক তুমি নও। মৃত্যুর স্বরূপটি একবার ভেবে দেখো। স্বমহিমায় বড় সুন্দর সে। জীবনকে সে মিলিয়ে দেয় অসীমের সমুদ্রে। মৃত্যু অমোঘ, মৃত্যু অজেয়, অপ্রতিরোধ্য। তার যখন যাকে নেবার, তখনই আসবে তার কাছে। মরণ কবিতার সেই লাইনটা মনে আছে? 'মৃত্যু- অমৃত করে দান।' জীবনের সাধনা পূর্ণ না হলে অমৃত পাবে কি করে ?"

আমি হাঁ করে ওনার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। ওনার কথা কিছুটা বুঝছি, বেশিটা বুঝছি না। উনি এবার আমার দিকে তাকিয়ে সহজভাবে হেসে বললেন – "আর কি সব যেন বলছিলে ? তুমি রিক্ত, কেউ তোমায় চায় না। সত্যি কি তাই ? আর সেটা যদি সত্যিও হয়, তবু একটু ভেবে দ্যাখ – তোমার তুমি, তোমার জীবন, এরা তো তোমার সঙ্গেই আছে। জীবন আছে মানেই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ সব আছে! চোখ মেলে তাকালে দেখবে আলোর সমুদ্রে পৃথিবী ভাসছে, বুক ভরে শ্বাস নাও, ফুলের সুবাস পাবে। কান পেতে শোনো – পাখীর ডাক, মৌমাছির গুঞ্জন শুনতে পাবে। এত কিছুর পরেও তুমি বলবে তুমি রিক্ত ?"

এই পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত জীবনের জয়গান ধ্বনিত হচ্ছে। সে সুরে সুর মিলিয়ে গাও – "আনন্দধারা বহিছে ভুবনে।" রবিঠাকুর গেয়ে উঠলেন। কী অপূর্ব সে গান! তিনি আমাকে বললেন – "গাও ! গাও তুমি !"

আমি চেষ্টা করলাম, কিন্তু সুরটা ঠিক মতো বেরোল না। ছায়ামূর্তি বললেন – "জমা জলে ময়লা জমে। তোমার সুর প্রবাহে অবসাদের ময়লা জমেছে। জোরালো একটা প্রাণের স্পর্শ পেলেই সব আবর্জনা ভেসে যাবে, সুরের দরজা তখন আপনিই খুলে যাবে।"

ছায়ামূর্তি একটু একটু হাসছেন। আমি গান গাইতে চেষ্টা করছি। আলোক রশ্মি একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে। সেই সাথে আমার রবি ঠাকুরও দূরে চলে যাচ্ছেন। আমি প্রাণপণে গান গাইতে চেষ্টা করছি। সুর বেরোচ্ছে না বলেই কি উনি রাগ করে দূরে চলে যাচ্ছেন? আমি ওনাকে থামাতে চাইছি, আমার কাছে ধরে রাখতে চাইছি, কিন্তু পারছি না।

তিনি দূরে চলে যাচ্ছেন, অনেক দূরে! আলোক-রশ্মি আকাশে মিলে গেল। সেই সাথে ছায়ামূর্তিও হারিয়ে গেল। আমি তখন আর্তনাদ করে উঠলাম! আমার আর্তনাদ গান হয়ে আমার কাছে ভেসে এলো।

চকিতে উঠে বসলাম। ঘুম ভেঙে দেখলাম, পুব আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। গান ভেসে আসছে বস্তির দিক থেকে। মনে পড়ল – আজ পঁচিশে বৈশাখ। সুধীন মাস্টার আর রাণীপিসি বস্তির ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রভাতফেরিতে বেরিয়েছেন। সবাই গলা মিলিয়ে গাইছে – "আলোকের এই ঝর্ণা ধারায় ধুইয়ে দাও। ..."

আমিও কাঠের বেঞ্চের শয্যা ছেড়ে চটপট উঠে পড়লাম – ওই প্রভাতফেরিতে যোগ দেবার জন্য! আমার সমস্ত অবসাদ, সব গ্লানি আজ গানের স্রোত-ধারায় ভাসিয়ে দিতে হবে। সুরের ঝর্ণা-ধারায় স্নান করে নতুন করে বাঁচব আমি!

স্বপ্না মিত্র

আমার রবীন্দ্রনাথ

ঊষার প্রথম আলো যখন ফুটিফুটি, পুব আকাশে সোনার থালা উদীয়মান, তখন আমার দাদু দু'হাত জোড় করে সূর্য প্রণাম করতেন। আমিও রোজ করি। রবি প্রণাম।

ভোর-ভোর ঘুম থেকে উঠে এক পেয়ালা চা হাতে দক্ষিণের বারান্দায় ইজিচেয়ারে এসে বসি। দার্জিলিং চায়ের স্বাদ আর সুবাসে ডুব দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখি চারপাশ। ভোরের প্রকৃতি বড় শান্ত, স্নিগ্ধ, মনোরম। আমার মাথার উপরে আকাশ, আর অন্তরের অন্তরতম অনুভব, দুইয়ের সঙ্গে সুরে, ছন্দে, তালে তাল মিলিয়ে গুনগুনিয়ে গাই, "আজ যেমন ক'রে গাইছে আকাশ তেমনি ক'রে গাও গো।"

সেই কোন অজ্ঞান বয়স থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয়। যেদিন প্রথম শুনি, "আমসত্ত্ব দুধে ফেলি, তাহাতে কদলী দলি, সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে – হাপুস হুপুস শব্দ চারিদিক নিস্তব্ধ, পিঁপীড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।" . . . আমার কচি মন এক অদ্ভুত ভালোলাগায় ভরে উঠেছিল।

"নদীর ঘাটের কাছে, নৌকো বাঁধা আছে/নাইতে যখন যাই দেখি সে, জলের ঢেউয়ে নাচে" . . .। কী অসাধারণ চিত্র বর্ণনা।

পাঠ্যবই সহজ পাঠ খুলে আমি দুলে দুলে পড়া মুখস্থ করি, আর আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটা নিখুঁত ছবি। আমি দেখতে পাই, যেখানে ঘাটের অদূরে কিঞ্চিৎ ঝোপঝাড়, নাম না জানা মোটা গুঁড়ির একটা বড় গাছ, গাছটার একটা লম্বা ডাল ঈষৎ নুয়ে ঝুঁকে আছে নদীর উপর, ঠিক যেখানে নৌকোটি বাঁধা। খোলা হাওয়ায়, জলের ঢেউয়ে, নৌকোটা অল্প অল্প দুলছে, নাচছে . . .

আজও এই লাইন দু'টি আমার বড় প্রিয়।

আমার মায়ের ছিল নিখাদ রবীন্দ্র প্রীতি। তাই চোখ মেলেছি, পা ফেলেছি থেকেই রবীন্দ্রনাথ। মা পড়ে পড়ে শোনাতেন, শিশু, শিশু ভোলানাথ থেকে কবিতা। মনে পড়ে ঘুমের সময় মায়ের সুরেলা গলায় "এক গাঁয়ে", "হারিয়ে যাওয়া" এমন কত কবিতা শোনার স্মৃতি। ছোটবেলায় ঠাকুরমার ঝুলির পাশাপাশি মা শোনাতেন রবিঠাকুরের গল্পও। আমার খুব প্রিয় ছিল "কাবুলিওয়ালা" আর "ডাকঘর"। "ডাকঘর" শুনতে শুনতে কখন যেন পৌঁছে যেতাম অমলের জানলার পাশে। আমি তখন মনে মনে ফুলের সাজি হাতে "সুধা"।

কোলকাতায় তখনও ঘরে ঘরে গ্যাসে রান্নার প্রচলন শুরু হয়নি। আমাদের বাড়ির বিশাল রান্নাঘরে জানলার পাশে দু'টো স্থায়ী কয়লার উনুন ছিল। আমার মত চপিং বোর্ডে ছুরি দিয়ে সবজি নয়, কুটনো কাটা হত বটিতে। একান্নবর্তী পরিবারে কত রান্না। মা বটিতে কুটনো কাটতে কাটতে নিচু গলায় আওড়াতেন কবিতা। স্মৃতি থেকে অনায়াসে আবৃত্তি করে শোনাতেন, "কর্ণকুন্তীসংবাদ", "গান্ধারীর আবেদন", "দেবতার গ্রাস" . . .

আমি গল্পের বইয়ের মতো পড়তাম কথা ও কাহিনী। এক কবিতা হাজারবার। "পায়ে পায়ে ঘাগরা উঠে দুলে, ওড়না ওড়ে দক্ষিণ বাতাসে। ডাহিন হাতে বহে ফাগের থারি, নীবিবন্ধে ঝুলিছে পিচকিরি, বামহস্তে গুলাব ভরা ঝারি – সারি সারি রাজপুতানি আসে।" ... কবিতার নাম "হোরিখেলা"। কবিতা, তাই সেখানে কল্পনার অবকাশ, শব্দগুলো

যেন অধরা, আলোছায়া মাখা, হাওয়ায় ভেসে ভেসে আসে . . . আর সেখানেই ম্যাজিক, চুম্বকের মতো আকর্ষণ . . . আমার মুগ্ধ শিশুমনে কত কত ছবি সার বেঁধে আনাগোনা করে যায়।

তখন ক্লাস থ্রি-তে পড়ি। পাড়ার ক্লাবে রিসাইটেশন কম্পিটিশন। প্রাইজ হিসেবে পেলাম রবিঠাকুরের বই। ছড়ার ছবি আর ঘরে বাইরে। ছ'বছর থেকে বারো বছর বয়সের গ্রুপে "ঘরে বাইরে" প্রাইজ হিসেবে বেমানান। তাই নিয়ে লোকজন টিপ্পনী কেটেছিল। তবে সৌভাগ্য যে, আমাদের বাড়িতে বইয়ের আলমারিতে কোনওদিন বড়দের-বই, ছোটদের-বই এরকম ভাগাভাগি ছিল না। যার যা ইচ্ছে, যে যেটা বোঝে, তা পড়ার অবাধ স্বাধীনতা ছিল। কয়েকদিনের মধ্যেই গোটা "ঘরে বাইরে" পড়ে শেষ করলাম। তবে বলাবাহুল্য যে, ওই বয়সে সে উপন্যাসের নিশ্চয়ই আমি কিছু বুঝিনি। তবু পড়েছিলাম।

হাসি-কান্নায়, মিলনে-বিরহে, সুখে-দুঃখে রবীন্দ্ররচনাবলী চিরকালই আমার পরম আশ্রয়। আমার অন্তরের অন্তরতম স্থানে সে এক দীপ্যমান রবি। যে আঁধার রাতে আলো দেয়, ঝড়ের রাতে সঙ্গী হয়, প্রতিদিন পথ দেখায়। লোকে ঈশ্বরের খোঁজে ঘোরেফেরে, আমি রবীন্দ্রনাথের লেখায় ঈশ্বরকে অনুভব করি। আমার মতে, রবীন্দ্রনাথ এক ধর্ম, এক যাপন ধারা। যিনি শুধুই উত্তরণ করেন, আলোকের ঝর্ণাধারায়।

রবীন্দ্রনাথের গান, কী বিপুল ব্যপ্তি তার, সংখ্যায় ও বৈচিত্র্যে। যে একবার রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রেমে পড়েছে, তার কাছে গানের কথা সুরকে ছাপিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ, উপন্যাস . . . শেষের কবিতার লাবণ্য, যোগাযোগের কুমুদিনী, ঘরে বাইরের বিমলা . . . ওঁরা যেন আমার আপনজন।

দারুণ অগ্নিবাণে, ঝরঝর মুখর বাদর দিনে, শরতের অরুণ আলোয়, হিমের রাতে, জীর্ণ শীতে, ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় . . . "চিরসখা, ছেড়ো না মোরে ছেড়ো না।"

রবীন্দ্রনাথের মনেও কি সময়ের সঙ্গে হারিয়ে যাওয়ার বা অচল বোধ হওয়ার দ্বিধা ছিল ? কবিতার নাম "১৪০০ সাল"। রচনা সময়, ২রা ফাল্গুন ১৩০২। আজ থেকে ঠিক একশো সাতাশ বছর আগে লেখা,

"আজি হতে শতবর্ষ পরে / কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি / কৌতূহল ভরে"

আবার "কবির বয়স" কবিতায়, "কেশে আমার পাক ধরেছে বটে, তাহার পানে নজর এত কেন? পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়ো / সবার আমি একবয়সী জেনো।"

আমার তো মনে হয়, একবয়সী নয়, পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়োর থেকে রবীন্দ্রনাথ এক আলোকবর্ষ এগিয়ে ছিলেন, আছেন, থাকবেন।

বাংলা সন ১৪২৯। পৃথিবী কত এগিয়ে গেছে। মঙ্গল গ্রহে পর্যন্ত মহাকাশযান পৌঁছে গেল। কিন্তু কালের প্রবাহে রবীন্দ্রসাহিত্য বা রবীন্দ্রসঙ্গীত এক তিল সেকেলে হয়ে যায়নি। বরং দিনে দিনে তা অতি আলোচ্য হয়ে উঠছে।

তবে রবীন্দ্রসাহিত্য হৃদয়ঙ্গম না করেও রবীন্দ্র অনুরাগীর সংখ্যা যে হারে বেড়ে চলেছে তা দেখলে "অমিত রায়" হয়তো বলতেন, "স্টাইল নয়, রবীন্দ্রসাহিত্য প্রীতি যে ফ্যাশন হয়ে যাচ্ছে !"

রূপা মজুমদার

প্রেমিকা পদ্মার বুকে একাকী রবি

রাণী চন্দকে একটি চিঠিতে লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ "গঙ্গা সাঁতরে তখন এপার ওপার হতাম – নতুন বৌঠান দেখে আতঙ্কে শিউরে উঠতেন।"

রবীন্দ্রনাথ গঙ্গার কোলে থেকেছেন, গঙ্গার বুকে সাঁতার শিখেছেন, গঙ্গার তীরে বড় হয়েছেন। তবু তিরিশ বছর বয়সে গঙ্গার তীর ছেড়ে তিনি চলে গেলেন পদ্মার তীরে।

কলকাতার মহল মহল্লা আর মজলিশ ত্যাগ করে বেছে নিলেন পদ্মার পারে নির্জন গ্রাম্য পরিবেশ। স্বনির্বাসন প্রায় টানা দশ বছর ।

মাত্র তেইশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ হারালেন নতুন বৌঠান কাদম্বরীকে। ক্রমশ অসহনীয় হয়ে উঠল রবীন্দ্রনাথের কাছে ঠাকুরবাড়ির পরিবেশ। তিনি উপলব্ধি করলেন প্রচার ও প্রশংসার আলো থেকে অনেক দূরের, ধ্যান ও নির্জনতার মধ্যে থেকে নিজেকে তৈরি করতে হবে। সেই বিস্তারিত নির্জনতা নেই কলকাতার গঙ্গার তীরে। একাকিত্ব এবং সৃজনের পরিবেশের জন্য তিনি বেছে নিলেন পদ্মার চর।

পদ্মার বুকে ঠাকুরদা দ্বারকানাথের "পদ্মা" – বোটে তরুণ প্রেমিকের মতো ভাসতে-ভাসতে ঘুরে বেড়ালেন নিঃসঙ্গ পদ্মাচরের অমাবস্যায় কিংবা পূর্ণিমায় স্রোতে।

সেই নিঃসঙ্গতার মাধ্যমেই হয়তো এল উপলব্ধি যে বিশ্বজগতের মাঝখানে তার স্থান।

> "কান পেতেছি, চোখ মেলেছি, ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি,
> জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান,
> বিস্ময়ে তাই জাগে আমার প্রাণ।"

এই কান পাতার বড় প্রয়োজন ছিল।

ধরার বুকে এই প্রাণ ঢালার বড় প্রয়োজন ছিল। ওই ধু-ধু ছাড়া, তৈরি হত না রবীন্দ্রনাথের অন্তরমহল। রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ উপলব্ধি করলেন এক নতুন বেদনার আলো, শুনতে পেলেন অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে নতুন আত্মীয়তার আহ্বান।

পদ্মার তীরে দশটা বছর যে রবীন্দ্রনাথ প্রতিদিন কত অকল্পনীয় বিপদের মধ্যে দিন কাটিয়েছেন কল্পনা করাও অসম্ভব। কী ভয়ংকর বেপরোয়া ছিলেন তিনি একটা নিদর্শন দিলেই স্পষ্ট হবে।

তিনি হঠাৎ ঠিক করলেন আসন্ন বর্ষার মুখে শিলাইদহে তাঁর আর তেমন জুতসই লাগছে না। তিনি শিলাইদহ থেকে সাজাদপুরে যাবেন। তাঁকে থামায় কার সাধ্য? সমস্যা হল পদ্মার একপারে শিলাইদহ, অন্যপারে সাজাদপুর। বর্ষার পদ্মা প্রায় সমুদ্র। যেমন বিস্তার, তেমনি তোলপাড়। ১৮৯৪ সালের পদ্মার সেই ভয়ংকর রূপ আজ অনেকটাই স্তিমিত। রবীন্দ্রনাথ সাজাদপুর যেতে চান শুনেই মাঝিদের প্রশ্ন –

– কোন পথে যাবেন বাবু? বর্ষার পদ্মা পাল তুলে পার হওয়া কি চাট্টিখানি ব্যাপার ?

রবীন্দ্রনাথ সহজ কণ্ঠে বললেন – পাবনার কাছে ইছামতী ধরবি। ইছামতী ধরে সোজা গিয়ে পড় হুড়াসাগরে।

– বর্ষায় হুড়াসাগর। বেঁচে ফিরব না কর্তা !

– কিন্তু আমার যে বর্ষার হুড়াসাগরের ভয়ংকর রূপটাই দেখতে ইচ্ছে করছে, আর তোরা ভয় পাচ্ছিস। চল তো ভেসে। হুড়াসাগরে একবার গিয়ে পড়। হুড়ার টানে ভেসে যাবি বড়ল নদীতে। তারপর বড়লের শাখা সোনাই ধরে নিবি। হু-হু করে ভেসে যাবি রাউতাড়ায়। ওখানে পালকি থাকবে। পালকিতে সোজা সাজাদপুরের কুঠিবাড়ি।

– কিন্তু কর্তা বড়ল যে আরও ভয়ের।

– তোরা যে মরার আগেই মরে আছিস রে! চল চল কোনও ভয় নেই . . .

– বর্ষাকালের রাত্রে সাজাদপুর যেতে গেলে কুঠিখাল দিয়ে যাওয়াই ভাল! বিপদ অনেক কম কর্তা।

– ছি ছি, রাজার মতো যাব হুড়াসাগর আর বড়ল পেরিয়ে। তার বদলে আমাকে খাল দিয়ে নিয়ে যাবি ? সাগর ছেড়ে নালাপথ ?

সত্যিই রবীন্দ্রনাথ ভরা বর্ষায় ধরেন হুড়াসাগরের পথ। এবং বর্ষায় পদ্মার তোলপাড় দেখতে উঠে যান বোটের ছাদে। একা দাঁড়ান মাস্তুল ধরে। ক্রমশ অন্ধকার নামে। এপার-ওপারের কোনো হদিশ নেই। অন্ধকার আকাশ জুড়ে খেলা করছে বিদ্যুৎ। বজ্রপাতের শব্দ। নামে বৃষ্টি। ঝাপসা হয়ে যায় উত্তাল পদ্মা। মাঝিদের আর্ত চিৎকার উপেক্ষা করে রবীন্দ্রনাথ একা দাঁড়িয়ে থাকেন বোটের ছাদে। তারপর গান বাঁধেন, এক আশ্চর্য গান, যে-গান কাউকে আর গাইতে শুনি না। পদ্মার বুকে টলমলে বোটের ছাদে দাঁড়িয়ে গাইছেন রবীন্দ্রনাথ :

"তোমরা হাসিয়া বাহিয়া চলিয়া যাও কুল কুল কল নদীর স্রোতের মতো।
আমরা তীরেতে দাঁড়ায়ে চাহিয়া থাকি, মরমে গুমরি মরিছে কামনা কয়।"

চারধারে মৃত্যুর হাতছানি। এবং সেই অনিশ্চয়তার মধ্যে পরোয়াহীনভাবে তিনি গান গাইছেন। এরপর এলো যমুনা। যমুনা পেরলে তাঁর বোট গিয়ে পড়বে হুড়াসাগরের অনিশ্চিত আবর্তে। এই মরণময় জলপথ পেরতে পারলে তো সাজাদপুরে লোশালসাগর ঘাট। যেখানে অপেক্ষা করছে তাঁর পালকি। কিন্তু সাজাদপুরে নামলেন না রবীন্দ্রনাথ। তাঁকে পেয়ে বসেছে নদীর নেশা। তিনি মাঝিদের আজ্ঞা দিলেন

– সাজাদপুরে বোট না থামিয়ে সোজা ভেসে যা পতিসরে ।

– কর্তা, এরপর পতিসর ? সে তো সমুদ্র পেরতে হবে !

– তা তো হবেই। চলনবিল তো নামেই বিল। সে তো সত্যিই সমুদ্র। বর্ষার রাত্রে চলনবিলকে সাগর বানায় আত্রাই নদী। চলনবিল পেরিয়ে আত্রাই পেরিয়ে অন্তহীন সাগর নদ। আহা!

এই দুরন্ত সাহসকে কী রোম্যান্টিক বেপরোয়ামি বলে না? একেই তো বলে প্রেম।

কিন্তু কার জন্য প্রেম ? পদ্মার প্রতি ?

হয়তো বা তাই। এক বুক প্রেম নিয়েই তিনি স্বেছানির্বাসন নিয়েছিলেন পদ্মা চরে। করেছিলেন সাধনা। যেই সাধনার ফলস্বরূপ ঠাকুরবাড়ির রবীন্দ্রনাথ নিজেকে ভেঙে গড়ে তুলেছিলেন, হয়ে উঠেছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ।

সুরজিৎ রায়

স্মৃতিকাহিনি জীবনস্মৃতিতে সংগীতের প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে লিখেছিলেন স্মৃতিকাহিনি "জীবনস্মৃতি" ও "ছেলেবেলা"। আর তাঁর সৃজন-জীবনের কাহিনি বর্ণনা করেছেন "আত্মপরিচয়" গ্রন্থে। এটি অবশ্য শান্তিনিকেতনের প্রদত্ত বিভিন্ন অভিভাষণ-সংকলন গ্রন্থ। জীবনস্মৃতি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১২ খ্রিঃ যখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ৫২ বছর। স্বভাবতই এই প্রৌঢ় বয়সেই বিস্মৃতির কুহেলিকা সরিয়ে কবি প্রসন্ন ও নির্লিপ্ত হয়ে তাঁর বাল্য ও তরুণ বয়সের স্মৃতিকাহিনি রচনা করেছেন। কবির এই প্রথম আত্মজীবনীতে অনেকগুলি নিবন্ধে রয়েছে সংগীতের প্রসঙ্গ ও উল্লেখ। এইসব প্রসঙ্গ থেকেই রবীন্দ্রনাথের সংগীতপ্রিয়তার সুস্পষ্ট নিদর্শন মেলে।

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিকাহিনি ছেলেবেলা তাঁর পরিণত বয়সে রচনা। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে। এ স্মৃতিকাহিনিতে শৈশবের নানান অনুভব ধরা পড়েছে, ধরা পড়েছে কথ্য ভাষার সহজ চলন। নীরব স্মৃতি ও ছেলেবেলা বই দুটি গ্রন্থেই গানের প্রসঙ্গ এসেছে, তফাৎ কেবল গদ্য ভঙ্গিমায়। জীবনস্মৃতি রচিত হয়েছিল সাধু ভাষার রীতিতে এবং ছেলেবেলা চলিত রীতিতে।

জীবনস্মৃতির ২ সংখ্যক নিবন্ধের শিরোনাম ঘর ও বাহির। কবি ছোটবেলায় অর্থাৎ বালক অবস্থায় ঘরের বাহিরে যেতে পারতেন না। বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল থেকে দেখতে হত। এই বিশ্বপ্রকৃতির রূপ, রস, গন্ধ এগুলি জানালার নানা ফাঁক দিয়ে তাঁকে ছুঁয়ে যেত। বিশ্বপ্রকৃতি ছিল মুক্ত আর কবি ছিলেন বদ্ধ। কবি লিখেছেন – বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল, এমনকি, বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন খুশি যাওয়া আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্ব-প্রকৃতিকে আড়াল আবডাল হইতে দেখিতাম। সে চিল মুক, আমি ছিলাম বদ্ধ – মিলনের কোন উপায় ছিল না। সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল। আজ সেই খড়ির গণ্ডি মুছিয়া গেছে, কিন্তু গণ্ডি তবু ঘোচে নাই। দূর এখনো দূরে, বাহির এখনো বাহিরেই। বড় হইয়া যে কবিতাটি লিখিয়াছিলাম তাহাই মনে পড়ে –

খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখি ছিল বনে,
একদা কী করিয়া মিলন হল দোঁহে,
কী ছিল বিধাতার মনে।

জীবনস্মৃতির ১২ সংখ্যক নিবন্ধের শিরোনাম "হিমালয় যাত্রা"। এখানে পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ভ্রমণের বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। অমৃতসর ভ্রমণকালে দেবেন্দ্রনাথ গুরু দরবারের একজন গায়ককে বাসায় এনে তাঁর কণ্ঠে ভজন গান শুনেছিলেন। সেই ভ্রমণে কবি মহর্ষিদেবকে মাঝে মাঝে ব্রহ্মসংগীত শোনাতেন। কবি লিখেছেন – "যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিত পিতা বাগানের সম্মুখে বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। তখন তাঁহাকে ব্রহ্মসংগীত শোনাইবার জন্য আমার ডাক পড়িত। চাঁদ উঠিয়াছে, গাছের ছায়ার ভিতর দিয়া জ্যোৎস্নার আলো বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। আমি বেহাগে গান গাহিতেছি –

তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে,
কে সহায় ভব-অন্ধকারে।"

তিনি নিস্তব্ধ হইয়া নতশিরে কোলের উপর দুই হাত জোড় করিয়া শুনিতেছেন – "সেই সন্ধ্যাবেলাটার ছবি আজও মনে পড়িতেছে।" এই ব্রহ্মসংগীত দেবেন্দ্রনাথের প্রিয় এটা বুঝে নিতে পারি। এ প্রসঙ্গে কবি তাঁর নিজের লেখা ব্রহ্মসংগীতের কথা উল্লেখ করেছেন, যে গান শুনিয়ে তিনি পিতৃদেবকে আনন্দ দিয়েছিলেন এবং পুরস্কারলাভ করেছিলেন – "একবার মাঘোতসবে সকালে ও বিকালে আমি অনেকগুলি গান তৈরী করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে একটি গান – 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে'। পিতা তখন চুঁচুড়ায় ছিলেন। সেখানে আমার এবং জ্যোতিদাদার ডাক পড়িল। হারমোনিয়ামে জ্যোতিদাদাকে বসাইয়া আমাকে তিনি নূতন গান সবকটি একে একে গাহিতে বলিলেন। কোনো কোনো গান দু'বারও গাহিতে হইল। গান গাওয়া যখন শেষ হইল তখন তিনি বলিলেন, 'দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত, তবে কবিকে তো তাহারা পুরস্কার দিত। রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই তখন আমাকেই সেকাজ করিতে হইবে।' এই বলিয়া তিনি একখানি পাঁচশ টাকার চেক আমার হাতে দিলেন।" গীতিকার, সুরকার এবং গায়ক হিসেবে এই স্বীকৃতি বালক কবিকে যথার্থ আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছিল তা বলাইবাহুল্য। এই ব্রহ্মসংগীতে রয়েছে একাকিত্বের বিষাদ ও শূন্যতা যা কবির রোমান্টিক বিষণ্ণতারই প্রভাব।

'জীবনস্মৃতি'র ১৩ সংখ্যক নিবন্ধে শিরোনাম 'প্রত্যাবর্তন' অংশে রবীন্দ্রনাথ কিশোরী চাটুজ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি এই কিশোরী চাটুর্জের পাঁচালি গান শুনেছিলেন এবং তাঁর কাছে কিছু পাঁচালি গান শিখেছিলেন – "সেই কিশোরীর কাছে অনেকগুলি পাঁচালির গান শিখিয়াছিলাম, 'ওরে ভাই জানকীরে দিয়ে এস বন', 'প্রাণ তো অন্ত হল আমার কম-আঁখি', 'রাঙা জবায় কী শোভা পায় পায়', 'কাতরে রেখো রাঙা পায়, মা অভয়ে', 'ভাবো শ্রীকান্ত নরকান্ত-কারীরে নিতান্ত বৃতান্ত-ভয়ান্ত হবে ভহে' – এই গানগুলিতে আমাদের আসর যেমন জমিয়া উঠিত এমন সূর্য়ের অগ্নি-উচ্ছ্বাস বা শনির চন্দ্রময়তার আলোচনায় হইত না।"

'জীবনস্মৃতি'র ১৫ সংখ্যক নিবন্ধের শিরোনাম 'বাড়ির আবহাওয়া'। কবি এই নিবন্ধে তাঁর খুড়তুতো দাদা গণেন্দ্রনাথের রচিত এই ব্রহ্মসংগীতের উদ্ধৃত করেছেন এবং একটি স্বদেশী সংগীতের প্রথম পংক্তি উল্লেখ করেছেন – "তাঁহার রচিত ব্রহ্মসংগীতগুলি এখনো ধর্ম সংগীতের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

গাও হে তাঁহার নাম
রচিত যাঁর বিশ্বধাম
দয়ার যাঁর নাহি বিরাম
ঝরে অবিরত ধারে –

বিখ্যাত গানটি তাঁহারই। বাংলায় দেশানুরাগের গান ও কবিতার প্রথম সূত্রপাত তাঁহারই করিয়া গিয়াছেন। সে আজ কতদিনের কথা যখন গণদাদার রচিত 'লজ্জায় ভারতযশ গাহিব কী করে' গানটি হিন্দুমেলায় গাওয়া হইত।" রবীন্দ্রনাথ নিজে কেবল সংগীতজ্ঞ ছিলেন তাই নয়, যথার্থ সাংগীতিক প্রতিভার কদরও করতেন তা বোঝা যায় এই উদ্ধৃতি থেকে।

এই সংগীত প্রসঙ্গে কবি তাঁর বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি কৌতুক নাট্য (BURLESQUE)-এর একটি গানের উল্লেখ করেছেন যে গানটির সঙ্গে অক্ষয় মজুমদারের উদ্দাম নৃত্যের বর্ণনা আছে। গানের অংশটি কবি এইভাবে উদ্ধৃত করেছেন –

"ও কথা আর বোলো না, আর বোলো না,
বলছ, বঁধু, কিসের ঝোঁকে –
এ বড়ো হাসির কথা, হাসির কথা, হাসবে লোকে –
হাঃ হাঃ হাঃ হাসব লোকে। –"

'জীবনস্মৃতি'র ১৭ সংখ্যক নিবন্ধের শিরোনাম 'গীতচর্চা'। এই নিবন্ধে কবি তাঁদের বাড়ির সাংগীতিক পরিবহ এবং দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাংগীতিক প্রতিভা এবং ব্যক্তিত্বের রূপরেখা অঙ্কন করেছেন। মূলতঃ কবির সংগীত রচনা জ্যোতিদাদার পিয়ানোর সুরে – "এক সময়ে পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতিদাদা নূতন নূতন সুর তৈরী করায় মাতিয়া ছিলেন। প্রত্যহই তাঁহার অঙ্গুলি নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুরবর্ষণ হইতে থাকিত। আমি এবং অক্ষয়বাবু তাঁহার সেই সদ্যোজাত সুরগুলিকে কতা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম। গান বাঁধিবার শিক্ষানবিশি এইরূপে আমার আরম্ভ হইয়াছিল। আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গান চর্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমার পক্ষে তাহার একটা সুবিধা এই হইয়াছিল, অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।"

'জীবনস্মৃতি'র ১৮ সংখ্যক নিবন্ধের নাম 'সাহিত্যের সঙ্গী'। এখানে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর কথা বলেছেন। বিহারীলাল চক্রবর্তী কবিকে খুব স্নেহ করতেন। কবি যখন তখন তাঁর বাড়িতে যেতেন এবং উদার হৃদ্যতার সঙ্গে তাঁকে আহ্বান জানাতেন, কবিতা শোনাতেন ও গান শোনাতেন – "তাহার পরে ভাবে ভোর হইয়া কবিতা শুনাইতেন, গানও গাহিতেন। গলায় যে তাঁহার খুব বেশি সুর ছিল তাহা নহে, একেবারে বেসুরোও ছিলেন না – যে সুরটা গাহিতেছেন তাহার একটা আন্দাজ পাওয়া যাইত। ... তাঁহার কণ্ঠের সেই গানগুলি এখনো মনে পড়ে – 'বালা খেলা করে চাঁদের কিরণে', 'কে রে বালা কিরণময়ী ব্রহ্মরন্ধ্রে বিহরে'। তাঁহার গানে সুর বসাইয়া আমিও তাঁহাকে কখনো কখনো শুনাইতে যাইতাম।"

'জীবনস্মৃতি'র ২০ সংখ্যক নিবন্ধের নাম 'ভানুসিংহের কবিতা'। কবি এক মেঘলা দিনে বারান্দায় বসে একটি কবিতা লিখেছিলেন – "একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলা দিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা স্লেট লইয়া লিখিলাম 'গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে'। লিখিয়া ভারি খুশি হইলাম" আমরা জানি পরে রবীন্দ্রনাথ এই গানটিতে সুরারোপ করেছিলেন যা 'ভানুসিংহের পদাবলী'তে অন্তর্গত।

জীবনস্মৃতির ২১ সংখ্যক নিবন্ধ 'স্বাদেশিকতা'তে কবি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুরু-বিক্রম নাটকের একটি গানের উল্লেখ করেছেন। গানটি রাজনারায়ণ বসু হাত নেড়ে সুরহীন গলায় গাইতেন। গানটি হল –

"এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।"

গানটি রবীন্দ্রনাথের রচনা কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। রবীন্দ্রনাথের কোন গীত গ্রন্থভুক্ত ছিল না গানটি। ১৩১২ বঙ্গাব্দে 'সংগীত প্রবেশিকা'য় বন্দেমাতরম ধুয়া সহযোগে স্বরলিপি প্রকাশিত হয়। ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে 'গীতবিতান' ৩য় খণ্ড সম্পাদনাকালে গানটি 'গীতবিতানে' প্রকাশিত হয়। গানটি খাম্বাজ রাগে রচিত একতালে নিবদ্ধ।

২৩ সংখ্যক নিবন্ধ আমেদাবাদ এই রচনাটি কবির প্রখ্যাত গল্প 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর পটভূমি। শাহিবাগের বাদশাহী প্রাসাদের ছাদের উপর গভীর রাতে নদীর দিকে চেয়ে কবির সময় কাটত। সেই সময় কবি নিজের সুর দেওয়া সর্বপ্রথম গানগুলি রচনা করেছিলেন – "এই ছাদের উপর নিশাচর্য করিবার সময়ই আমার নিজের সুর দেওয়া সর্বপ্রথম গানগুলি রচনা করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে 'বলি ও আমার গোলাপবালা' গানটি এখনো আমার কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আসন রাখিয়াছে।"

'জীবনস্মৃতি'র ২৮ সংখ্যক নিবন্ধে 'বাল্মীকি প্রতিভা'-য় কবি তাঁর স্বরচিত গীতিনাট্যের গান রচনা সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা করেছেন। অনেকগুলি গানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুর আছে একথাও কবি স্বীকার করেছেন, আবার অক্ষয়কুমার চৌধুরীর কয়েকটি গানও ব্যবহার করেছেন – "বাল্মীকি-প্রতিভার অনেকগুলি গান বৈঠকি-গান-ভাঙা, অনেকগুলি জ্যোতিদাদার রচিত গতের সুরে বসানো এবং গুটি তিনেক গান বিলাতি সুর হইতে লওয়া। আমাদের বৈঠকি

গানের তেলেনা অঙ্গের সুরগুলিকে সহজেই এইরূপ নাটকের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাইতে পারে; এই নাট্যে অনেক স্থলে তাহা করা হইয়াছে। বিলাতি সুরের মধ্যে দুইটিকে ডাকাতদের মত্ততার গানে লাগানো হইয়াছে এবং একটি আইরিশ সুর বনদেবীর বিলাপগানে বসাইয়াছি।" বাল্মীকি প্রতিভায় অক্ষয়বাবুরও যে অবদান আছে সে প্রসঙ্গে বলেছেন – "বাল্মীকি-প্রতিভায় অক্ষয়বাবুর কয়েকটি গান আছে এবং ইহার দুইটি গানে বিহারী চক্রবর্তী মহাশয়ের সারদামঙ্গল সংগীতের দুই-এক স্থানের ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে।"

'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতিনাট্যে রবীন্দ্রনাথ যে প্রভাবের কথা স্বীকার করে নিয়েছিলেন, সেই সম্পর্কে আলোকপাত করা যাচ্ছে। " 'রাঙাপদ পদ্ম যুগে প্রণমি গো ভবদারা' বাল্মীকির এই গানটি এবং দস্যুদের 'এত রঙ্গ শিখেছ কোথায় মুণ্ডমালিনী' গানটির রচয়িতা অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী। বিহারীলাল চক্রবর্তী 'সারদামঙ্গল' কাব্যের অংশ বিশেষের প্রভাব বাল্মীকির 'কোথায় সে ঊষাময়ী প্রতিমা' গানটির বিভিন্ন ছত্রের ভিতর পড়েছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' (অক্টোবর, ১৮৭৫) কাব্যের 'জয় জয় পরব্রহ্ম' গানটির কিছু প্রভাব বাল্মীকির 'এই যে হেরি গো দেবী আমারি' গানটির ওপর পড়েছে।"

'জীবনস্মৃতি'র ৩৬ সংখ্যক প্রবন্ধ 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'। কবি যখন কারোয়া থেকে ফিরছিলেন তখন জাহাজে বসে কয়েকটি গান লিখেছিলেন। খুব আনন্দের সঙ্গে প্রথম গানটির সুর দিয়েছিলেন – "কারোয়ার হইতে ফিরিবার সময় জাহাজে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'র কয়েকটি গান লিখিয়াছিলাম। বড়ো একটি আনন্দের সঙ্গে প্রথম গানটি জাহাজের ডেকে বসিয়া সুর দিয়া-দিয়া গাহিতে-গাহিতে রচনা করিয়াছিলাম –

হ্যাদে গো নন্দরাণী,
আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও –
আমরা রাখাল বালক গোষ্ঠে যাব
আমাদের শ্যামকে দিয়ে যাও।"

৪১ সংখ্যক নিবন্ধে (বর্ষা ও শরৎ) দুটি শরৎ অনুষঙ্গের গানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন কবি। কবির মনে হয় তারুণ্যের সেই দিনগুলো আশ্বিনের বিস্তৃতি অবকাশের মাঝখানে শরতের ঝলমলে দিনগুলোর মত। সেইসব শরতদিনে দক্ষিণের বারান্দায় গান বাঁধা আর সুর সংযোজনার স্মৃতি প্রৌঢ় কবিকে স্মৃতি ভারাতুর করে তুলেছে – "তখনকার জীবনটা আশ্বিনের একটা বিস্তীর্ণ স্বচ্ছ অবকাশের মাঝখানে দেখা যায়। সেই শিশিরে-ঝলমল-করা সরস সবুজের উপর সোনা-গলানো রৌদ্রের মধ্যে, মনে পড়িতেছে, দক্ষিণের বারান্দায় গান বাঁধিয়া তাহাতে যোগিয়া সুর লাগাইবার গুন্‌গুন্‌ করিয়া গাহিয়া বেড়াইতেছি, সেই শরতের সকাল বেলায় –

আজি শরত-তপনে প্রভাত স্বপন
কী জানি পরাণ কী যে চায়

বেলা বাড়িয়া চলিতেছে, বাড়ির ঘন্টায় দুপুর বাজিয়া গেল, একটা মধ্যাহ্নের গানের আবেশে সমস্ত মনটা মাতিয়া আছে, কাজকর্মের কোনো দাবিতে কিছুমাত্র কান দিতেছি না, সেও শরতের দিনে –

হেলাফেলা সারাবেলা
এ কী খেলা আপন-মনে।"

এই দুটি গানের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের ঋতুবোধের দিগন্তটি ধরা পড়ে। শরতের মধুর উজ্জ্বল আলোর মধ্যে মানুষের উৎসবকে কবি খুঁজেছেন, বাতাসের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের আবেগকে এক হয়ে যেতে দেখেছেন।

রমা সিনহা বড়াল

আমার রবিঠাকুর

তখন পড়ি ক্লাস এইট'এ। পরেরদিন পঁচিশে বৈশাখ, আমাদের রবিঠাকুরের জন্মদিন। আমরা ক্লাস ফোর, সিক্স, ও এইটে পড়া তিনবোন খুব উত্তেজিত, কারণ আগামীকাল দিদি আমাদের জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি নিয়ে যাবে রবীন্দ্র জয়ন্তীর অনুষ্ঠান, ও ঠাকুর বাড়ি দেখাতে। ছোটবেলা থেকেই রবিঠাকুর বড় আপন মনে হতো। সেই সহজপাঠের "জল পড়ে, পাতা নড়ে", বা "আজ জঙ্গল সাফ করার দিন" লেখা দিয়ে তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয়। "শিশু" কবিতায়, শিশু বয়সে, তাঁর লেখার মধ্যে যেন নিজেদের খুঁজে পাই।

যাই হোক পরদিন ভোর পাঁচ'টার সময় উঠে তৈরি হয়ে রওনা হলাম জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির উদ্দেশে। গণেশ টকীর মোড়ে বাস থেকে নেমে রবীন্দ্র সরণী ডান দিকে ট্রামলাইন ধরে খানিক এগোতেই আমাদের স্বপ্নের ঠাকুরবাড়ি। দলে দলে মানুষ অনুষ্ঠান শুনতে যাচ্ছে। মাইকে ভেসে আসছে সুরেলা রবীন্দ্র সঙ্গীত, কবিতা আবৃত্তি, শ্রুতি নাটকের আওয়াজ। রবিঠাকুরের বসত বাড়ি এখন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের জোড়াসাঁকো ক্যাম্পাস। এই বাড়ির কিছু অংশ তাঁর জন্মস্থান হিসাবে সংরক্ষিত। বাকি অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস, নাচ, গান, অভিনয়ের ক্লাস হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সেই আম্রপালী আমের গাছ, ঢাকা দেওয়া ঝুল বারান্দায় কাঠের রেলিং – ছোট রবির কাঠের রেলিং এ ছিপটি মেরে ঘোড়া ঘোড়া খেলার সঙ্গী, যার বর্ণনা "আমার শৈশব" বইতে আমরা পাই, চোখের সামনেই সে সব দেখতে দেখতে নিজের শৈশব কে অনুভব করতে পারলাম। মূল সংরক্ষিত বাড়ির দোতলায় যেখানে বালক রবির জন্ম ও ধীরে ধীরে বড়ো হয়ে ওঠা, সেই সুন্দর করে আল্পনা দেওয়া, ফুল দিয়ে সাজানো ঘরে প্রবেশ করে, মনে হলো যেন মন্দিরে এলাম। মনের মধ্যে অনুভব করলাম এক অদ্ভুত প্রশান্তি। হাতে করে নিয়ে আসা ফুলের স্তবক রেখে প্রণাম জানালাম। রবিঠাকুরের ও তাঁর পরিবারের ব্যবহৃত জিনিস সুন্দর করে সংরক্ষিত করা আছে। বাড়ির সামনে মঞ্চ থেকে শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রের উদাত্ত কণ্ঠে ভেসে আসছে "হে নূতন দেখা দিক আবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ"।

সেই ছোট বয়স থেকে আমাদের রবিঠাকুরের সঙ্গে পরিচয়। শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবন, যৌবন থেকে পরিণত বয়স্ক – জীবনের প্রতিটি স্তরে তাঁর লেখা পড়লে মনে হয় এতো আমার মনের কথা! কৈশোরের শুরুতে যেমন আমাদের অনুসন্ধিৎসা খুব বেশি হয়। তাই সে বয়সের উপযোগী লেখা "শিক্ষার বাহন", "গোরা" ও আরো অনেক ছোট গল্পের সাথে নিজেদের একাত্ম করা যায়। রবীন্দ্র গীতিনাট্য / নৃত্য নাট্য, – "বাল্মিকী প্রতিভা", "তাসের দেশ", "কালমৃগয়া" মনকে নাড়া দেয়। এই প্রসঙ্গে বলি এই নৃত্য নাট্যগুলি আমাদের রবিঠাকুরকে আরো কাছে নিয়ে এসেছে। "কালমৃগয়া" বললেই ছোটবেলায় নূপুরের (অনুশ্রী) আশ্রম বালিকা ভূমিকায় নৃত্য, "তাসের দেশে" হরতনির ভূমিকা আমার নৃত্য, হেলেন, জোনাকির যথাক্রমে রাজপুত্র ও সদাগর পুত্রের নৃত্যাভিনয়, চন্ডালিকা "তে নূপুরের 'প্রকৃতি", আমার দৈ ওয়ালা, চুড়িওয়ালার ভূমিকায় নৃত্যাভিনয়ের কথা মনে পড়ে যায়। এগুলির মধ্যে দিয়ে আমরা তখন আমাদের কৈশোরের রবীন্দ্রনাথ কে চিনেছিলাম।

যৌবনের আকুতি, উন্মাদনা আমাদের জানিয়ে ছিল 'শ্যামা', 'চিত্রাঙ্গদা', 'মায়ারখেলা', 'শাপমোচনের' মতো নৃত্য নাট্য। প্রেম, ভালবাসার আনন্দ, বিচ্ছেদের বেদনা, তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে এতো সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। গান বা কবিতার কথাগুলি যেন আমাদের মনের ভিতরের কথা।

পরিণত বয়স এ "সীমার মাঝে অসীম তুমি . . .", বা "বিশ্ববীণা রবে বিশ্বজন মোহিছে . . ." ইত্যাদি গানের মধ্যে দিয়ে জীবনকে অনুভব করা যায়। জীবনের শেষ প্রান্তে বন্ধুর প্রয়োজন প্রকাশ হয় "জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে বন্ধু হে আমার রয়েছো দাঁড়ায়ে . . ." মধ্যে দিয়ে।

প্রকৃতির নানাবর্ণের রূপ তাঁকে মুগ্ধ করতো। ছয় ঋতু কে বর্ণনা করে সৃষ্টি ঋতুরঙ্গ। প্রতিটি লেখাই আলাদা করে প্রতি ঋতুকে চিনিয়ে দেয়। গ্রীষ্মের বর্ণনা "দারুণ অগ্নিবাণে . . .", বর্ষার "আজ বারি ঝরে ঝরঝর . . .", হেমন্ত "হেমন্তে ঐ বসন্তের . . ." শীত "হিমের রাতে ঐ গগনের . . .", বসন্ত "ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে . . .", গানের কথাই চিনিয়ে দেয় সেইঋতু।

এই মহান ব্যক্তিত্বের জীবন সম্বন্ধে ধ্যান ধারণার কোন পরিমাপ নেই। তাঁর প্রতিটি লেখার মধ্যে দিয়ে বোঝা যায় তিনি জীবনের শেষ বিন্দু অবধি তার রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ কে অনুভব করতে ভালবাসতেন। জীবনের সাথে প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য বন্ধন তিনি প্রাণভরে উপভোগ করতেন। তাই সৃষ্টি করেছিলেন "শান্তিনিকেতন" এর।

তিনি ছিলেন একাধারে কবি, গায়ক, লেখক, ঔপন্যাসিক, চিত্রশিল্পী, বৈজ্ঞানিক, দেশপ্রেমিক এবং মনস্তাত্তিক। বর্তমান চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁর গান রোগীর ব্যথা, যন্ত্রণা উপশমের কাজে ব্যবহৃত হয়। আমি নিজে তার সুফল পেয়েছি। মন খারাপ থাকলে ভাল রবীন্দ্র সঙ্গীত মনকে ভাল করে দেয়। গানের কথা, সুর কানের মধ্যে দিয়ে মর্মে প্রবেশ করে।

"রবির কিরণে" আলোকিত আমরা নিজেদের বিকশিত করতে পেরেছি, জীবন বোধে সমৃদ্ধ করতে পেরেছি সেই "শিশুকাল" থেকেই তাঁর "সহজপাঠের" মধ্যে দিয়েই। পঁচিশে বৈশাখ তাই তাঁর ভাষাতেই বলি, "আজি হতে শতবর্ষ পরে . . ." আমরা আজও তাঁর কবিতা দিয়েই তাঁকে জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করি। অন্তরের প্রণাম জানাই এই মহাকবিকে।

মহুয়া সেন মুখোপাধ্যায়

মরণ হতে যেন জাগি

"আত্মসম্মান যখন কমে যায় তখন অনাদরকে তো অন্যায্য বলে মনে হয় না। সেইজন্যে তার বেদনা নেই। তাই তো মেয়েমানুষ দুঃখ বোধ করতেই লজ্জা পায়। আমি তাই বলি, মেয়েমানুষকে দুঃখ পেতেই হবে, এইটে যদি তোমাদের ব্যবস্থা হয়, তা হলে যতদূর সম্ভব তাকে অনাদরে রেখে দেওয়াই ভালো; আদরে দুঃখে ব্যথাটা কেবল বেড়ে ওঠে।"

এই কথাগুলি মৃণালের – রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীর পত্রের মেজোবৌয়ের। এই গভীর অন্তর্দৃষ্টি, এমন দীপ্যমান চরিত্র যা আজকের দিনেও পাঠকের মনে বিস্ময় জাগিয়ে রাখে – কিভাবে এতো সময় পার হয়েও একটা চরিত্র এতটা প্রাসঙ্গিক থাকতে পারে।

যখন মৃণালের বিয়ে হয়, সে কিশোরী। কিন্তু সেই বয়সেই সে জানতো কেন তার এতো বড় বাড়িতে বিয়ে হলো। সে জানতো সে সুন্দরী। প্রত্যন্ত গ্রামে ছোট জায়গাতে সে বড় হয়। শুধু রূপের জন্য বহুদূরের শহর থেকে, বনেদী পরিবারের মানুষজন আসে তাকে বৌ করে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু রূপ যে বিশেষ কিছু, সে বিষয়ে তার সচেতনতা, অহংকার কোনো কিছুই দেখা যায়নি। তবে সে নিজের বুদ্ধির কথা জানতো, অনায়াসে অন্য মানুষদের ভেতরটা পড়ে ফেলতে পারতো। সে জানতো তার এই অন্তর্দৃষ্টি এবং স্পষ্টবাদিতাকে লোকে ভয় পায়, খানিকটা সমীহ করে। সেটাকে হাতিয়ার করে অনেকক্ষেত্রে সে কিছুটা হলেও নিজের বিবেক অনুযায়ী কাজ করতে সক্ষম হতো। তার জায়ের বোন বিন্দুকে আশ্রয় দেওয়া তার মধ্যে অন্যতম।

মৃণাল মানুষটাই ছিল আশ্রয়দাত্রী, সে দুর্বল অসহায় প্রাণী হোক বা ছোট বোনের মতো একটি মেয়ে-যার এই পৃথিবীতে কেউ নেই। আর এই আশ্রয় দেওয়ার মধ্যে এতটুকু খাদ ছিল না। তার দেওয়া মানে সব দেওয়া। বিয়ের পর পাগল স্বামীর ভয়ে বিন্দু যখন তাদের বাড়িতে পালিয়ে আসে, তখন পুরো পরিবারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বিন্দুকে সে গ্রহণ করতে চায়, কিন্তু বিন্দুই তার একমাত্র ভালোবাসার মানুষটাকে কোনো বিপদে ফেলতে চায় না। সে চলে যায়। তার বাড়ি থেকে। তারপর পৃথিবী থেকে।

আর বিন্দুর চলে যাওয়া মৃণালের কাছে শেষ কুটোটুকু ভেঙে যাওয়া। মাথার ওপরের ছাদ আর চার দেওয়ালের আশ্রয় ছাড়িয়ে সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে সে দ্বিধাহীন অমোঘ উচ্চারণে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করতে পারে। আজও ভাবি – কিভাবে এতটা সময়ের আগে ছিল সে? প্রসঙ্গক্রমে মনে হচ্ছিলো এই গল্পের কত বছর পরে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের লেখা উপন্যাস "দহন" যেখানে একটি মহিলা সাংবাদিক আর একটি মেয়ের পাশে দাঁড়িয়েছিল, তার সাথে হওয়া আক্রমণের, অসম্মানের তীব্র প্রতিবাদ করে। আক্রান্ত মেয়েটিকে আইনি বিচার পেতে সাহায্য করতে চেয়েছিলো। কিন্তু পিতৃতান্ত্রিকতার হাত থেকে রেহাই পায়নি দুজনের কেউই; সবচেয়ে ভালোবাসার মানুষের হাত ধরেই দাঁত নখ দেখিয়েছিলো সমাজ। কিন্তু দুটি মেয়ের কেউই প্রতিবাদ করে চলে যেতে পারেনি। মেনে নিয়েছিল। কিন্তু স্ত্রীর পত্রে অত বছর আগে একজন সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, নিজস্ব পরিচয়হীন, ঘরের বৌ পেরেছিলো। প্রতিবাদ রাখতে।

অনিলাও চলে গেছিলো। সমস্ত কিছু ছেড়ে, "পয়লা নম্বর" গল্পে। কিন্তু স্ত্রীর পত্রের মৃণালের সাথে তার এক বিশাল পার্থক্য আছে। স্ত্রীর পত্রে মেজোবৌ নিজের কথা বলে। কিন্তু পয়লা নম্বরে অনিলাকে দেখতে পাই সম্পূর্ণ ভাবে তার স্বামীর বর্ণনায়। বেশ কিছুদিন আগে আমি চোখের ডাক্তারের কাছে একটি পরীক্ষায় গেছিলাম। খুব ছোট ছোট ছিদ্র

দিয়ে ঢাকা একটি পাতের মধ্যে দিয়ে পড়ার চেষ্টা করতে হয়েছিল দূরের অক্ষর মালা। কখনো পড়া যায়, কখনো যায় না। কিন্তু অনুমানে বোঝা যায়। সেভাবেই অদ্বৈতচরণের বলা গল্পে, তার ফেলা আলোতে অনিলাকে দেখতে পাই আমরা। তার পরিসর বড় ছোট। তার সংসারে মুখ বুজে স্বামীর ইচ্ছে পালন করে চলেছে, সেটা ছাড়া তেমন কিছু বোঝা যায় না। সংসারের চাকা ঘুরছিলো মসৃণভাবে। তার অনুগামীদের ভোজের আয়োজন হচ্ছিলো নিয়মিত-তার পেছনের মানুষটির দিকে কোনোদিন তিনি তাকান নি। ভুলেও। গল্পে অদ্বৈতবাবুর নিজের জ্ঞান, বাগ্মিতা, বুদ্ধির প্রশংসা, তার আমিময় জীবন পেরিয়ে একটু একটু দেখা গেছে অনিলাকে, সংসার সামলানোতে, কখনো বাবার মৃত্যুর পর ভাইয়ের দায়িত্ব নেওয়ায়। কেমন দেখতে তাকে ? কি ভাবতো সে? কি ভালোবাসতো ? অদ্বৈতবাবুর চোখ দিয়ে দেখা পৃথিবীতে তার অন্যমনস্ক চোখের বাইরেই রয়ে গেছে অনিলা – সম্পূর্ণ অবহেলায়। তার আশাভঙ্গ – একজন সম্পূর্ণ অসংবেদনশীল মানুষের সাথে থাকা, যে তাকে গৃহস্থলী চালানোর যন্ত্র ছাড়া কিছুই ভাবে না, তাতে অনিলার হৃদয় কতটা ভেঙেছিল, তা পাঠকের সামনে এলো কখন ? যখন তার স্বামী বুঝলো। অনিলা সংসার ছেড়ে চলে যাবার পর। অদ্বৈতচরণের কথায় –

"সংসারে যে-মেয়েকে বেদনার পৃথিবী বহন করতে হয় তার সে-পৃথিবী মুহূর্তে মুহূর্তে নূতন নূতন আঘাতে তৈরি হয়ে উঠছে। সেই চলতি ব্যথার ভার বুকে নিয়ে যাকে ঘরকন্নার খুঁটিনাটির মধ্যে দিয়ে প্রতিদিন চলতে হয়, তার অন্তরের কথা অন্তর্যামী ছাড়া কে সম্পূর্ণ বুঝবে। অন্তত, আমি তো কিছুই বুঝি নি। কত উদ্‌বেগ, কত অপমানিত প্রয়াস, পীড়িত স্নেহের কত অন্তর্গূঢ় ব্যাকুলতা, আমার এত কাছে নিঃশব্দতার অন্তরালে মথিত হয়ে উঠছিল আমি তা জানিই নি।"

অদ্বৈতবাবু তার আগে কিছুই দেখেননি। চোখ তুলে প্রথম তার দিকে তাকান যেদিন অনিলা তার ভাইকে চিরদিনের মতো হারিয়ে, তার জীবনের চরম আঘাতটা পেয়েছে, এবং ভেতরে প্রলয় ঘটে গেছে, বেঁচে থাকার শেষ মানে টুকুও যেন হারিয়ে গেছে তার জীবন থেকে। অনিলাকে হারানোর পর, তার মনটা তার স্বামী বুঝতে পেরেছিলেন প্রথমবার-তার ভালোবাসা, তার অপ্রাপ্তি, তার সাথে হওয়া অবহেলা।

"আমি জানতুম, যেদিন দ্বৈতদলের ভোজের বার উপস্থিত হত সেইদিনকার উদ্যোগপর্বই অনিলার জীবনের প্রধান পর্ব। আজ বেশ বুঝতে পারছি, পরম ব্যথার ভিতর দিয়েই এ সংসারে এই ছোটো ভাইটিই দিদির সবচেয়ে অন্তরতম হয়ে উঠেছিল।"

স্ত্রীর পত্রে মৃণাল তার সমস্ত অভিযোগ, অভিমান তার অবমাননা জানিয়ে সংসার ত্যাগ করেছে। তবে তার আঘাত, তার চলে যাওয়া পিছুটানহীন। কোথাও কোনো হারানোর দুঃখ নেই, দ্বিধা নেই, হতাশা নেই। সমস্ত কিছু ছিঁড়ে, একক যাত্রা। অনিলার যাওয়াও তাই। তবে তার কাউকে কিছু বলে যাবার ইচ্ছাটুকুও ছিল না, সে হারিয়ে যেতে চেয়েছিলো – এতটাই যে তার সামাজিক দুর্নাম হতে পারে, সে পরপুরুষের সাথে চলে গেছে ভেবে সমস্ত সমাজের চোখে ব্রাত্য হতে পারে-এই বোধটারও তার কাছে কোনো মূল্য ছিল না। তার এতদিনের সংসার জীবনই তার কাছে সম্পূর্ণ মূল্যহীন হয়ে গেছিলো। অনিলার এই তীব্র অনীহা একদিনে হয় নি . . . তিল তিল করে করে হয়েছিল। তার এই সব কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার সাথে কিছুটা যেন মিল খুঁজে পাই রবীন্দ্রনাথের আর একটি গল্প শাস্তির চন্দরার সাথে। স্বামী যখন তার দাদার রাগের মাথায় স্ত্রীকে হত্যা করার দায় চন্দরার ওপর চাপিয়ে দিলো, সেই বিশ্বাসঘাতকতা চন্দরা সহ্য করতে পারেনি। সেই অপবাদ, লাঞ্ছনা তার অস্তিত্বকে শিকড় থেকে উপড়ে নিয়েছিল। তার আত্মাভিমান তাকে ফাঁসিকাঠের দিকে নিয়ে গেছিলো, সোজাসুজি। প্রথাগত শিক্ষা, শহুরে পালিশ কিছুই ছিল না চন্দরার – কিন্তু তার, তার প্রতিবাদ বাংলা সাহিত্যে নারী চরিত্রদের মধ্যে কালজয়ী করে রেখেছে।

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট দুই নারী।

স্ত্রীর পত্রে মৃণাল চারকোলে আঁকা ছবি . . . স্পষ্ট, দৃপ্ত, তীক্ষ্ণ আবার মায়ায় ভরা-স্নেহে, আদরে সহমর্মিতায় সে ছিলো' অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো। নিজের কষ্টটা নিজের ছিল না মৃণালের। কিন্তু ভুল, ঠিকের পার্থক্যে সে ছিল আপোষহীন। অত্যাচারিতের পক্ষে দাঁড়ানোতে, তার নিজের পায়ের তলার মাটি কোথায়, সেদিকেও ফিরে তাকায়নি সে। তাই বিন্দু যখন পৃথিবী ছাড়লো, তার সরু গলির মধ্যেকার শ্বশুরবাড়ির চেপে আসা, দমবন্ধ করা দেওয়াল তাকে আটকাতে পারলো না একটা হ্যাঁচকা টানে বিরাট পৃথিবীর মাঝখানে এনে ফেললো। অন্যদিকে অনিলা যেন জলরঙে আঁকা আবছা অবয়ব। তাকে বুঝে নিতে হয় পাঠকের নিজস্ব অনুভূতির আলোয়। তার ইচ্ছে, তার ভালোবাসা আর ভালোবাসাহীনতা, তার কর্তব্যবোধ, তার আশাভঙ্গ – সবকিছুই।

গল্পের শেষে আমরা বুঝতে পারি মৃণালের চারদিকে এক আলোময় পৃথিবীর উন্মেষ হয়েছে, অনন্ত সম্ভাবনায় ভরা। যতই কঠিন হোক দুর্গম হোক, সামনে চলার পথ সে নিজেই ঠিক করে নিতে পারবে। অনিলার জীবনে সেটা আমরা জানি না। সম্পূর্ণ ভেঙে যাওয়া মন নিয়ে কি পথ বেছে নেবার জন্য সব ছেড়ে চলে গেছিলো সে। কিন্তু আশা করতে ইচ্ছে করে মৃণালের মতোই "বজ্রানলে নিজের বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে" সে চলতে পারবে।

সে চলতে থাকবে। একা।

অর্পিতা চ্যাটার্জি

অন্ধকারের অন্তরধন

নাহ এবারেও হল না বুঝলেন। মানে কি হলো বলি। ব্যাপারটা হলো, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে লিখতে হলে তো একটু পড়াশোনা করে, কোন বিষয় নিয়ে লিখব সে সমস্ত সম্পর্কে একটু ভাবনা চিন্তা করে তবে তো লিখতে হবে। যেমন-তেমন ব্যাপার তো নয় না! সেইমত ভাবনা চিন্তা চলছিল। সে রকম ভাবেই একবার ভাবলাম গল্প লিখব। গল্প লিখতে শুরু করে ভাবলাম, কি যে লিখি! মনে করা যাক, একটি ছোট্ট ছেলের গল্প। তার সাথে হয়তো রবীন্দ্রনাথের দেখা হয়ে গেল। সূক্ষ্মমূর্তিধারী। ছোটরা অমন অনেককিছুই দেখে। আমাদের চালশে চোখে সেসব ধরা না পড়ারই কথা। তা সে যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হলেই সে কি আর চিনতে পারবে রবীন্দ্রনাথ বলে? সে বন্ধুর মতই গল্প করবে। উনিই কী আর ধরা দেবেন? কিন্তু উনি দেখতে এসেছিলেন যে ওনার সৃষ্টি গুলো আমরা কিভাবে ব্যবহার করছি! কিভাবে তার আন্তরিক মর্মার্থ উপলব্ধি করছি! সেসব বোঝার জন্য। তারপর হয়তো মনে করা যাক সেই ছেলেটিকে একটি সুন্দর গান শিখিয়ে দিয়ে গেলেন। যে গানটি শেখার বা বোঝার মতো উপযুক্ত পরিবেশ ছেলেটির ছিল না! এরকম একটা কিছু লিখতে শুরু করেছিলাম বুঝলেন, এই কথোপকথনের ভঙ্গিতে লিখছিলাম। কিন্তু সে ঠিক হলো না মনের মত। মানে গল্পটা ঠিক নিজের লেখা বলে মনে হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল যেন অন্য কেউ লিখেছে। ঠিক সঠিক ভাবটা প্রকাশ করা যাচ্ছিল না। আসলে ব্যাপারটা হলো রবীন্দ্রনাথ ব্যাপারটাই এমন, যে ঠিক ভালো মতো করে না বুঝলে বা ভালোমতো করে তার গভীরতা উপলব্ধি না করলে, লেখা তো দূরের কথা, কথা বলাই উচিত নয়। গভীর, গম্ভীর বিষয়।

যাই হোক, গল্প বাদ হয়ে গেল। তারপর ভাবলাম যে নিজের উপলব্ধির কথা কিছু লিখব। কিন্তু সে আর সময় কোথায়! এত কাজ! এই মনে করুন ল্যাব থেকে ফিরে এলাম। ফিরে এসে ভাবলাম, হ্যাঁ ঘন্টা দুই সময় আছে। বেশ সুন্দর শব্দবন্ধ ব্যবহার করে সুন্দর একটা লেখা লিখে ফেলতে হবে। কম্পিউটার স্ক্রিনে ওয়ার্ডটা খুলে বসলাম। চোখ বুজে মনের ভাব দেখার চেষ্টা করেছি। বিশেষ কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ চাইতেই দেখলাম সামনের বুকসেলফে কি যেন একটা বই উঁকি মারছে। কিরকম তেড়েবেঁকে ছিঁড়েখুঁড়ে আছে, আর মাথার উপর থেকে একটা লাল রঙের বুকমার্ক, সম্ভবত কোন একটা ছেঁড়া কাগজ, উঁকি মারছে। কি বই দেখতেই হয়। কারণ এরকম ছিঁড়েখুঁড়ে হাত ভাঙ্গা হয়ে কার্ডবোর্ডটা বেরিয়ে আছে যে একটু মেরামত করতেই হয়। তারপর কৌতূহলবশতঃ একটুখানি খুলতেই হয়। ওই লাল বুকমার্কটা খুলে দেখলাম পুরোনো গীতবিতান। প্রথম পাতায় নীলকালির কলমে লেখা প্রথম প্রেমের উপহারের দুলাইন। কত গান পাতায় পাতায়! কত প্রেম গানে গানে! কত আবেগ পংক্তিতে পংক্তিতে! কত স্মৃতি অক্ষরে অক্ষরে! এতবছরে এত বেশি নাড়াচাড়া হয়েছে যে প্রায় ছিঁড়ে আসছে। একটু মেরামত করতেই হয়। বসলাম মেরামত করতে। তারপর মেরামত করতে করতে একটু আধটু তো খুলে দেখতেই হয়। এরপরে আর কি! পরপর কয়েকটা গান গাইতেই হয় গুন্‌গুন্‌ করে। ওই যে লাল বুকমার্কটার কথা বলছিলাম না, ওটা খুলে দেখি ওখানে রয়েছে, "তোমায় গান শোনাবো তাইতো আমায় জাগিয়ে রাখো ওগো ঘুম ভাঙ্গানিয়া।" তেমন করে প্রথমবার শুনেছিলাম এই লাইনকটা অনেকদিন আগে। পি.এইচ.ডি. করছিলাম যখন তখন একবার এবং শেষবার রবীন্দ্রজয়ন্তী উদ্‌যাপন করা হয়েছিল আমার। ল্যাবের কয়েকজনকে নিয়ে ল্যাবের তিনতলার কনফারেন্স রুমটা বুক করে "রক্তকরবী" শ্রুতিনাটক হিসেবে আমরা পাঠ করেছিলাম। দর্শক ছিল ওই ল্যাবের লোকজন এবং সমস্ত সায়েন্টিস্টরা। সঙ্গে নাচ গান মিলে বেশ ভালো অনুষ্ঠান হয়েছিল মনে পড়ে। সেখানে একজন সিনিয়র দাদা বিশু পাগলের ভূমিকায় নাটকে গলা দিয়েছিল। বিশু পাগলের ভূমিকায় তাকে নেওয়ার প্রথম কারণ, গান। সেই প্রথম তার গলাতে আমি ভালো করে শুনি এই গান। তার

আগে শুনেছি। কিন্তু ওই মহড়ার সময় বারবার শুনে শুনে গানটার মর্মার্থ বুঝতে পারছিলাম, আর শিহরিত হচ্ছিলাম। তারপর থেকে এই গানটা চিনতে আমার ভুল হয় না। পাতা উল্টালাম, "প্রেমের জোয়ারে ভাসাবো দোঁহারে বাঁধন খুলে দাও।" পরের বার পাতা উল্টালাম, "মধুর বসন্ত এসেছে।" সত্যিই এখন বসন্ত। মনে পড়ল যখনই এরকম দরকার হয়, মনের পরিস্থিতি অনুসারে তার উপযুক্ত একটা না একটা লাইন আপনি পেয়ে যাবেন একটা পাতায়। সেইজন্যই বইটার এরকম দশা। বারবার উল্টেছি। বারবার খুঁজেছি। একটা লাইন পেয়েছি। বারবার গেয়েছি। বইটার বাঁধাই আস্তে আস্তে ছিঁড়েছে। মনটা আস্তে আস্তে জোড়া লেগেছে। বই সারাই আর হলো না শেষ পর্যন্ত। একটার পর একটা পাতা উল্টে গেলাম, গুন্‌গুন্‌ করে গেয়ে গেলাম একটার পর একটা গান। এমনই হয় বারবার। প্রতিবার। হাতে থাকা দু'ঘণ্টা কিভাবে কেটে গেল বুঝতে পারলাম না। কখন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখব বলুন ?

ছুটির দিনে লিখতে বসলাম। ছুটির সকালে তো লেখাই যায়। পুরনো স্কুলের বান্ধবীর ফোন। চরম অসুস্থ শরীর নিয়ে অসম্ভব মনের জোরে লড়াই করে চলেছে। মুখে হাসির কমতি নেই। আর তার সাথে কবিতা। নতুন করে শিখছে। জীবনকে জয় করতে চায়। বললে, "একটা নতুন কবিতা শিখছি, শুনবি ? ভালো করে শুনে বলবি কিন্তু ভালো হচ্ছে কিনা।" বললাম "বল।" কি শুরু করলে বলুন তো? "পূজারিণী"। গড় গড় করে বলে গেল, আর আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনে গেলাম। শেষ করে বলল, "একটা অনুষ্ঠান আছে। এখনো ভালো করে তুলতে পারিনি, আরেকটু অভ্যাস করতে হবে।" আমার তো তা মনে হলো না। মনে হলো সত্যি পূজা করছিল। বললাম, "তোর অনুষ্ঠান হয়ে গেলে আমার জন্য একটা কবিতা ভালো করে তুলে আমাকে শোনাবি।" বললে, "বল"। আমি আবদার করলাম, "হোরিখেলা।" শোনাবে বলেছে, অপেক্ষা করছি। পূজারিণীর গল্পে আর পূজারিণী পরিবেশন হবে যে অনুষ্ঠানে সে অনুষ্ঠানের গল্পে কিছুটা সময় গেল। তার শারীরিক কোন খবর নেওয়া হলো না। আমরা কবিতা শুনলাম। কবিতা বললাম। পূজারিণীতে ডুবলাম। রবীন্দ্রনাথে ডুবলাম। ছুটির পুরো সকালটা চলে গেল। কখন আর লিখবো বলুন তো রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ?

ভাবলাম ল্যাবে গিয়ে অল্প অল্প করে টাইপ করব কাজের ফাঁকে ফাঁকে। তারপর কি করে যেন কানে হেডফোন লাগিয়ে কাজ করতে করতে ইউটিউবে কোন একটা রবীন্দ্রসংগীতের লিংক থেকে একটা জায়গা থেকে একটা জায়গায় চলে যাচ্ছিলাম। লিংকের পর লিংক। পরের পর গান। পরের পর। সুর। কি করে সুর বানিয়েছেন জানিনা। গানের কথা অনুযায়ী তার তাল স্থির হয়েছে। তার ছন্দ স্থির হয়েছে। চলন স্থির হয়েছে। সকাল থেকে দুপুর হয়ে গেল। কানে রবীন্দ্রনাথের গান লাগিয়ে একটার পর একটা কাজ শেষ হলো। মাঝে টুকটাক সময়ও পেলাম। কিন্তু লেখা হলো না। সুরগুলো মাথার মধ্যে ঘুরছিল। কানের ভেতর থেকে ভেতরে গিয়ে ঢুকছিল। আমাদের ল্যাবটা পশ্চিমমুখী। জানলা দিয়ে বিকেলের রোদ এসে পড়ে। আজকাল রোদ অনেকক্ষণ থাকে। বেলা বেড়েছে। কাজ যখন শেষ হলো তখন বিকেল বললে ভুল হবে, হয়তো ভারতবর্ষের হিসেবে সেটা সন্ধ্যে। জানলা দিয়ে লালচে আলো এসে ঢুকছে শেষ বেলার। কানে বাজছে "দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে।" বাঁশি যে কোথায় ফেলে গেছে কে তার হিসেব রাখে ! বাঁশি খুঁজতে খুঁজতেই এত বছর কাটছে। জানিনা খুঁজে পাব কিনা। তারপর সে বাঁশিতে সুর তুলতে পারব কিনা সে বুঝি আরো দূরের কথা। তবুও বাঁশি যে একটা আছে, এবং সেই বাঁশিটিকে খুঁজে পাওয়াটাই যে জীবনের লক্ষ্য, এটা অন্তত রবীন্দ্রনাথের গান প্রথম আমায় শিখিয়েছে। বাঁশির খোঁজ করতে করতে সন্ধ্যে নেমে এল। ঘরে ফিরলাম। রাতের বেলা বৃষ্টি আর মেঘের শব্দে ঘুম ভাঙ্গল। অন্ধকারে চোখ খুলে প্রার্থনা করলাম, "একলা ঘরে চুপে চুপে এসো কেবল সুরের রূপে। দিয়ো গো, দিয়ো গো, আমার চোখের জলের দিয়ো সাড়া।"

আপনিই বলুন এত বেনিয়মে রবীন্দ্রনাথে মন দিই কীকরে ? আমার তাই এবারেও আর রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কিছু লেখা হয়ে উঠল না।

শেলী শাহাবুদ্দিন

রবীন্দ্রনাথ, পূর্ব-পাকিস্তান ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত যে রবীন্দ্রনাথের লেখা, তা শুধু রবীন্দ্ররচনার মেধার জন্য নয়, বাঙালির আত্মার সাথে রবীন্দ্র চেতনার বন্ধনের গভীরতা তার মূল কারণ।

ধর্ম, সীমান্ত, আর রাজনীতি যত জাতের মেকি দেয়াল তৈরী করে থাকুক, সকল দেশেই মৌলবাদী ছাড়া আর প্রায় সকল বাঙালির সাংস্কৃতিক মনন একই সূত্রে গাঁথা। আমি তাঁদের কথা বলছি।

মুসলমান প্রধান পূর্ব পাকিস্তানে এবং তারপরে বাংলাদেশে স্বাধীনতা বিরোধী প্রশাসন ও মৌলবাদীদের অবিশ্রান্ত বাধা ও আক্রমণ সত্ত্বেও কি ভাবে রবীন্দ্রনাথ বাঙালি মুসলমানের হৃদয়ে ক্রমশ গভীরভাবে প্রবেশ করেছেন, আমি তার কথা বলছি।

নজরুল এবং আরো সব বাঙালি কবিও বাঙালির আত্মার অংশ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিভিন্নভাবে তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছেন ঐতিহাসিকভাবে। আমার শৈশব কেটেছে কাকা-কাকিমার সাথে পশ্চিম পাকিস্তানে। আট বছর বয়স পর্যন্ত আমি কবি ইকবাল ছাড়া আর কোন কবির নাম জানতাম না। আট বছর বয়সে ১৯৫১ সালে আমি যখন পূর্ব পাকিস্তানে ফিরি, তখন আমি বাংলার চাইতে উর্দু ভালো বলতে পারি। এরপর ১৯৫৩ সালে আমি সরাসরি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হই। তখন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই।

কিন্তু এরপর, অল্প কয়েকবছরের মধ্যে আমি রবীন্দ্রভক্ত হয়ে পড়ি।

আমার মধ্যে রবীন্দ্রভক্তির বীজ বপন করেন মূলত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শহীদ, কবি ও সাংবাদিক সেলিনা পারভীন, যিনি আমার মেজবোন 'ছুট্টু'।

দেশ বিভাগের সময় বা তার আগে থেকেই পূর্ব বাংলার অনেক পরিবারেই যে রবীন্দ্রচর্চা ও রবীন্দ্রভক্তি প্রবল ছিল, তার একটি উদাহরণ সেলিনা পারভীন।

সহায় সম্বলহীন নির্যাতিতা সেলিনা পারভীন তাঁর ঘরে রবীন্দ্রনাথের ছবি টাঙিয়ে সারাজীবন যে সাধনা করে গেছেন, তাকে একলব্যের সাধনার সাথে তুলনা করা চলে।

ছবিও আঁকতেন সেলিনা পারভীন। ছবিগুলির ক্যাপশন ছিল সবই রবীন্দ্রনাথের কবিতা। যেমন,

"আমি বহু বাসনারে প্রাণপণে চাই, বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে।"

"খুঁজিতেছি কোথা তুমি, কোথা তুমি, যে অমৃত লুকোনো তোমায়, সে কোথায় ?"

"পশ্চিম পানে অসীম সাগর, চঞ্চল আলো আশার মতো কাঁপিছে জলে।"

"জীবনের ধন কিছুই যাবেনা ফেলা।" ইত্যাদি।

এই ছবিগুলি আমাদের দেশের বাড়ির দেয়ালে টাঙানো থাকতো। ফলে বছরের পর বছর ওই ছবিগুলি আর ক্যাপশন আমার মনে গভীর প্রভাব সৃষ্টি করে। ক্যাপশনগুলি আমার মনের মধ্যে স্থায়ী মূল্যবোধ হয়ে দাঁড়ায়।

দুর্ভাগ্য আমাদের, যুদ্ধের কারণে সেলিনার এইসব ছবি আর কবিতাগুলি হারিয়ে যায়।

বাবার সাথে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে 'ছুট্টু'র লড়াইয়ের একটি ঘটনা আমি উদ্ধৃত করছি তাঁর জীবনী গ্রন্থ থেকে।

"মফস্বল শহরে কবিতার বই তখন দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনেক বই ছুট্টু তখনি সংগ্রহ করে ফেলেছেন। ছুট্টুর রবীন্দ্রভক্তি ছিল প্রবল। তাঁর ছবিগুলির ক্যাপশনেও সেটা প্রতিফলিত হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে আমার রবীন্দ্রভক্তির মূলেও ছুট্টু। গল্পগুচ্ছ আর সঞ্চয়িতা ছুট্টুর কাছ থেকে নিয়েই আমার প্রথম পাঠ।

কিন্তু বুড়ো বয়সে দুষ্ট লোকের পাল্লায় পড়ে বাবা রবীন্দ্রবিরোধী হয়ে গেলেন। জটিল বিষয় হলো বাবা তখনও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসা করেন। বাবার পান্ডিত্য, ব্যক্তিত্ব, প্রায় আধ্যাত্মিক জীবন যাপন, বয়স, ইত্যাদি সব মিলিয়ে আমাদের মাঝখানে একটা প্রবল অদৃশ্য দেয়াল ছিল। বাবাকে আমরা ভয় পেতাম।

কিন্তু ছুট্টু পৃথিবীর কোন দেয়াল মানতেন না। বাবা সে সময় ছুট্টুর ওপর অনেক রকম মানসিক অত্যাচার করতেন। দুজনের মধ্যে অনেক ঠান্ডা লড়াই আমি দিনের পর দিন চলতে দেখেছি। কিন্তু ছুট্টু যখন ইচ্ছা নিজের খেয়াল খুশি মত এই দেয়াল ডিঙিয়ে অনায়াসে বাবার কাছে পৌঁছে যেতে পারতেন। সে ক্ষমতা তাঁর ছিল। আমি অবাক হয়ে আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতাম। বাবা তখন সুবোধ বালকের মতো কিছুক্ষণের জন্য ছুট্টুর বাধ্য হয়ে থাকতেন।

একদিন কোন কারণে ছুট্টু ঠিক করলেন বাবাকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা শোনাবেন। বাবা কিছুতেই শুনবেন না। বলেন, "এসব শোনাও পাপ।"

কিন্তু ছুট্টু শোনাবেনই। আমি আড়াল থেকে দুরু দুরু বুকে দেখছি, আর মনে মনে আল্লা আল্লা করছি।

অবাক হয়ে দেখি শেষ পর্যন্ত ছুট্টুই জিতেছে। বাবা শান্ত হয়ে বসে ছুট্টুর কাছ থেকে গীতাঞ্জলি শুনছেন। ছুট্টু অনেকগুলি কবিতা পড়ে শোনালেন। একসময় বই বন্ধ করে ছুট্টু বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এবার বলুন।"

বাবা গম্ভীর ভাবে বললেন, "ও বেটা কোরানশরীফ থেকে টুকেছে।"

ছুট্টুর মুখ তখন হাসি আর আনন্দে উদ্ভাসিত। বাবা যে কবিতাগুলির সর্বোচ্চ প্রশংসা করছেন, সেকথা আমিও বুঝতে পেরেছিলাম(১)।"

১৯৬১ সালে আমি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার পরে ছাত্র রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে পড়ি। তখন একসময় দেখি রবীন্দ্রনাথ আমাদের আন্দোলনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই সম্পর্কের অন্যতম ক্যাটালিস্ট ছিল ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন। আবার অন্যদিকে ভাষা আন্দোলনের পর থেকে বাংলাদেশের সকল আন্দোলনে প্রেরণার কাজ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্ত, জীবনানন্দ এবং আরো সব বাঙালি কবি। কিন্তু সকল কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেন আন্দোলনের প্রধান শক্তি।

ভাষা আন্দোলনের সময় ভাষা ও আন্দোলন নিয়ে অনেক গান তৈরী হয়েছিল দেশের আনাচে কানাচে। রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতার ভিত্তিতে প্যারোডি তৈরী হয়েছিল শাসকদের আক্রমণ করে।

সাতচল্লিশের ভারতবিভাগের পর তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে রবীন্দ্রচর্চা যদিও বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তা ছিল আংশিক। শিক্ষিত সমাজের এক অংশের কাছে রবীন্দ্রচর্চা ছিল অপরিহার্য্য। কিন্তু বাঙালি মুসলমান সমাজের এক রক্ষণশীল অংশ রবীন্দ্রবর্জনের পক্ষে ছিলেন।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পর সমাজের প্রগতিশীল অংশ আবহমান বাংলার শিল্প সংস্কৃতির চর্চায় উত্তরোত্তর আগ্রহী হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রচর্চার প্রসার ঘটে তার অংশ হিসাবে। কিন্তু তখনো এদেশে রবীন্দ্রচর্চা ছিল আংশিক ও সীমিত।

সম্ভবত শিক্ষিত সমাজের ভেতরে দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবীদের দ্বৈত ভূমিকার কারণে সাধারণ অসাম্প্রদায়িক মুসলমান সমাজের একটি বড় অংশ তখনো রবীন্দ্রচর্চায় আগ্রহী হয়ে উঠতে পারে নাই।

১৯৫৮ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের পর পূর্ব-পাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চেষ্টা বন্ধ করা হয়। শেষ পর্যন্ত একসময় পূর্ব-পাকিস্তানে রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

ফলে হিতে বিপরীত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ শিক্ষিত মানুষের মনে বিদ্রোহের যে ছাইচাপা আগুন এতদিন ধিকিধিকি জ্বলছিল, এই নিষেধ সেই আগুনকে আরো উস্কে দেয়। এই নিষেধাজ্ঞার ফলে সকল বাঙ্গালি অপমানিত বোধ করে, এবং বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

ইতিপূর্বে বাঙালির জীবনযাত্রা, বাঙালির শিল্প-সংস্কৃতি, এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বহু বিষয়ে পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালিদের বিদ্রুপ, ভীতি প্রদর্শন, ও অপমান সইতে হতো প্রতিদিন। প্রায় বিশ বছর সাধারণ শিক্ষিত বাঙালি সেটা সহ্য করেছে বিস্ময়কর নীরবতায় ! কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিষিদ্ধ করার পরে তারা হঠাৎ বিদ্রোহ করে বসে।

কিন্তু এই বিদ্রোহ অকস্মাৎ বিস্ফোরিত হয় নি। রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধ হওয়ার পরে প্রথমে রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীরা বিভিন্ন ঘরোয়া অনুষ্ঠানে গোপনে গান গেয়ে এই বিদ্রোহের সূচনা করেন। তারপর তাঁরা কিছু কিছু নির্বাচিত অনুষ্ঠানে প্রকাশ্যে রবীন্দ্রসংগীত গাইতে শুরু করেন গ্রেফতার এড়িয়ে।

ঐতিহাসিকভাবেই এদেশে সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ছাত্র সমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সে সময় এইসব রবীন্দ্রসংগীতের সিংহভাগ অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংগ্রামী ছাত্র সমাজের পৃষ্টপোষকতায়। সামরিক শাসনের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে যে সব মহান রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী এই বিপজ্জনক কাজ শুরু করেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সঞ্জীদা খাতুন, ফাহমিদা খাতুন, অজিত রায়, কলিম শরাফী ইত্যাদি। ঢাকা মেডিকেল কলেজে এঁরা তখন গান গাইতে আসতেন। আমরা তরুণ ছাত্ররা তাঁদের পাহারা দিতাম। আমরা জানতাম যে আমাদের প্রাণ থাকতে তাঁদের কেউ স্পর্শ করতে পারবেনা।

এই আইন অমান্য আন্দোলনের জনসমর্থন কালক্রমে এতো প্রবল হয়ে ওঠে যে সামরিক সরকার তাদের নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।

"পঞ্চশরে দগ্ধ করে, করেছ একি সন্ন্যাসী! বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।"

এই সময় থেকে পূর্ব-পাকিস্তানে রবীন্দ্রচর্চা এবং রবীন্দ্রসংগীত চর্চার জনপ্রিয়তা ক্রমাগত প্রসারিত হতে থাকে। বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তখন থেকে যে গতি সঞ্চারিত হয়, রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রসংগীত ছিল তার অন্যতম নিয়ামক শক্তি।

এই আন্দোলনের অন্যতম উৎস ছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে বাঙালির ক্ষোভ ও ক্রোধ।

কিন্তু বিস্ময়কর বিষয় এই যে, পূর্ব-পাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধান উৎস ছিল পশ্চিমা শাসকদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, যার বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘটে ভাষা আন্দোলন দিয়ে।

বাঙালির দৈনন্দিন জীবন যাপন, বাঙালির সংস্কৃতি, এমনকি বাঙালির ধর্মাচরণ নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষকে দেশবিভাগের পর থেকে শেখানো হয়েছিল বর্ণবাদী বাঙালি ঘৃণা। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি প্রতিদিন পশ্চিম

পাকিস্তানিদের হাতে অপমানিত হতো তাদের দৈনন্দিন আচরণ, খাওয়া-পরা, শিল্প-সাহিত্য, এবং তার ধর্মাচরণ ইত্যাদি সব সাধারণ বিষয়ে।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বঞ্চনার বিষয়টি সাধারণ মানুষ প্রথমে বুঝতেও পারেনি। সেটি সামনে নিয়ে আসেন 'জাতির পিতা' শেখ মুজিবুর রহমান।

বিদ্রুপ, অপমান, ভীতি প্রদর্শন, ও অন্যান্য সামাজিক অসম্মানের ফলে শিক্ষিত সাধারণ মানুষের মনে যে বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে চলেছিল, ভাষা আন্দোলন ও রবীন্দ্রলাঞ্ছনার কারণে তার সাথে যুক্ত হয় মানুষের মনের প্রচন্ড আবেগ। উনসত্তরের সামরিক শাসন বিরোধী গণআন্দোলনের সময় থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ অবধি এই আবেগ ক্রমাগত বৃদ্ধি লাভ করে। ধূমায়িত ক্ষোভ একসময় বিদ্রোহের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখায় রূপান্তরিত হয়।

উনিশ'শ একাত্তর সালে যে সকল দেশপ্রেমিক বাঙালি সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতে না পেরে অবরুদ্ধ বাংলায় সীমাহীন আতঙ্ক, উদ্বেগ, আশা-নিরাশা, আর অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হয়েছেন, প্রতিদিন মৃত্যুবরণ করেছেন, প্রতিদিন পুনর্জীবন লাভ করেছেন, তখন কারা ছিলেন তাঁদের অন্তরের প্রধান তিন মৃতসঞ্জীবনী শক্তি?

এই তিনজন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও শেখ মুজিবুর রহমান। আবার যুদ্ধক্ষেত্রে বাংলার মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্কটে সংগ্রামে যাঁরা অনুপ্রাণিত করেছেন, তাঁদের মধ্যেও রবীন্দ্র-নজরুল-মুজিব ছিলেন প্রধান তিন শক্তি।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে দুই প্রধান আধ্যাত্মিক শক্তি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল।

মুক্তিযুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যে কত বিপুল তার প্রমাণ শুধু এই সত্যেই প্রকাশিত যে বাংলাদেশের জাতীয়সংগীত তাঁরই রচিত।

মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ারুল হক লিখেছেন, *"বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়টাতে আমি সোনামুড়ার মেলাঘর ক্যাম্পে ট্রেনিংয়ে ছিলাম। এ প্রশিক্ষণ ক্যাম্পটি ছিল 'কে' ফোর্সের অধীন। আমাদের সামরিক প্রশিক্ষণে নেতৃত্ব দিয়েছেন গেরিলা কমান্ডার ক্যাপ্টেন হায়দার। একদিকে দেশের জন্য যুদ্ধ করব এ উদ্দীপনা বুকের ভেতর, অন্যদিকে অনভ্যস্ত কঠোর সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে গজারি শাল সেগুনের বিশাল বনে কয়েকটি টিলার ওপরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে টানানো তিরপলের তাঁবুর নিচে সহযোদ্ধারা একসঙ্গে রাত কাটাই। পাহাড়ে জঙ্গলে ঝুপ করে রাত নেমে এলে কোনো আলো জ্বালানো যেত না। বিভীষিকাময় এমন রাতে স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে প্রচারিত রবীন্দ্র-নজরুল সঙ্গীত আর দেশাত্মবোধক গানগুলো আমাদের প্রত্যেকের চেতনায় তরল আগুন জ্বেলে দিয়ে আত্মবিসর্জন দেয়ার শক্তি সঞ্চার করত"।*

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বিজয়ের আবেগের সাথে ভাষা ও তার অন্তর্নিহিত শক্তি, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য বাঙালি কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক বিষয়ক আবেগ একত্রিত হয়। শিল্প-সাহিত্যের সকল শাখা সহ রবীন্দ্রচর্চার এক অভূতপূর্ব অভ্যুত্থান ঘটে এই নবীন রাষ্ট্রে। প্রায় সমগ্র শিক্ষিত সমাজ রবীন্দ্রচর্চায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। রবীন্দ্র সংগীত শেখানোর জন্য ক্রমাগত সারা দেশে গড়ে ওঠে ছোট বড় অসংখ্য প্রতিষ্ঠান। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। শ্রোতার সংখ্যা এবং আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ায় গণমাধ্যম গুলিতে রবীন্দ্রচর্চার প্রসার ঘটতে থাকে। সর্বোপরি, রবীন্দ্রনাথের কবিতা হয় বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। তার গভীর কারণ ছিল এই ইতিহাস।

উনিশ শ পঁচাত্তর সালের স্বাধীনতা বিরোধী নৃশংসতা ও বাংলাদেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরে মৌলবাদের যে পুনরুত্থান ঘটে, তার বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে দেশে অসাম্প্রদায়িক সমাজ যে সকল উপাদান ব্যবহার করেন, তার অন্যতম শক্তি হয়ে দাঁড়ায় পুনরায় রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রসংগীত।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পার হয়ে রবীন্দ্রনাথের জন্য এই আবেগ কি আজ স্তিমিত ?

কালের প্রবাহে যে কোন বিষয়ে আবেগ স্তিমিত বা সীমিত হয়ে আসা স্বাভাবিক। কিন্তু ইতিমধ্যে বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। সাধারণ শিক্ষিত মানুষের জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে রবীন্দ্রনাথ।

উপমহাদেশে আজ যখন আবার আমাদের মনে পরাজয়ের ভয়, তখন আমাদের অন্তর্দৃষ্টিতে সেই অতিমানব পৃথিবীর সকল পর্বত-প্রান্তর-মহাসমুদ্রের ওপরে দাঁড়িয়ে, ওপরে আকাশ ছাড়িয়ে, জ্যোতির্মন্ডল ছাড়িয়ে, সৃষ্টিকর্তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাদের জন্য গাইছেন,

"বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা –
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান।।"

সংগ্রামী লাহিড়ী

রাজার রাজা

জোড়াসাঁকোর বিশাল বাড়িতে সমবয়েসি মেয়েটি ছিল রবির ছেলেবেলার খেলার সাথী। নাম জেনে কী হবে ? থাক না ওটা রহস্যের আড়ালে। জীবনস্মৃতিতে রবিও তো প্রকাশ করেনি কখনো ? রহস্যে ঘিরে রেখেছে বাল্যের সঙ্গিনীকে। কেন না, সে-ই যে রবিকে রহস্যের দরজাখানি প্রথম চিনিয়ে দিয়েছিল।

বালিকা প্রায়ই বলত এক রাজার বাড়ির কথা। সেখানে তার নিত্য আনাগোনা। কিন্তু কী আশ্চর্য, সে রাজার বাড়ি আর কেউ দেখতে পায় না। তাই রবিকে শুধু গল্প শুনেই খুশি থাকতে হয়। সে এক আশ্চর্য খেলার জায়গা। আশ্চর্য তার খেলনাগুলি। রবি অবাক হয়ে শুনত। কতবার জিজ্ঞেস করেছে, "কোথায় সে রাজার বাড়ি ?"

উত্তর এসেছে, "এই তো, এই বাড়ির মধ্যেই।"

বালক আরও আশ্চর্য হয়েছে। এই বাড়ির সব ঘর, বারান্দা, সিঁড়ি তো তার চেনা! কই, দেখতে পায়নি তো ? অসীম কৌতূহলে শুধোয়, "সেটা কি অত্যন্ত কাছে? একতলায়? দোতলায়?"

বালিকার চোখ নেচে উঠেছে কৌতুকে, "কোনো একটা জায়গায়।"

বালক রবির ডাগর দুই চোখে অপার বিস্ময়, "আমি তোমার সঙ্গ ধরতে পারিনে?"

বালিকার চোখে ছেয়ে আসে কেমন এক স্বপ্নের ঘোর। কল্পনাপ্রবণ মনটি পাখা মেলে। কেমন যেন এক অন্য পৃথিবীর অচেনা সুর বাজে তার গলায়। এ রাজার বাড়িতে নিজে নিজেই যেতে হয়, কারোর সঙ্গে যাওয়া চলে না।

বালক রবি, ভাবুক রবি হারিয়ে যায় তার চিন্তার রাজ্যে। কী যেন ধরা দিয়েও দিচ্ছে না।

তবে কি আমাদের সবারই একজন করে রাজা থাকে, তাকে নিজেই খুঁজে নিতে হয়? সে রাজার বাড়িতে বোধহয় শুধু একলাই যাওয়া যায়, সঙ্গী হতে পারে না কেউ। রবিও কি একদিন তার নিজস্ব রাজার বাড়িটি খুঁজে পাবে?

চিত্রা দেবের লেখা "ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল" বইটি থেকে আমরা জানতে পারি, শৈশবের খেলার সেই সঙ্গিনীটি আর কেউ নয়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বড় মেয়ে সৌদামিনীর কন্যা ইরাবতী। সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাগনি। নদীর মতই চঞ্চল, উচ্ছল। সমবয়েসি মামার মনের অকর্ষিত জমিটিতে সেই যে নিজের অজান্তেই স্বপ্ন-দেখানো বীজ বুনে দিয়ে গেল, সেই বীজ থেকে হল চারা, তা থেকে মহীরুহ ডালপালা মেলে দিল। সেই শৈশবেই রবির অন্তরে রাজা তাঁর আসনখানি পাতলেন, যে রাজা পরে নানারূপে ফিরে ফিরে আসবেন তার সৃষ্টিতে। কত গল্প-নাটক-কবিতায় আর গানে রবি লিখে গেছে তার সেই একান্তই আপন রাজাটির কথা, কত বিভিন্ন রূপে রাজা ধরা দিয়েছে রবির কাছে, ভেবেও অবাক হতে হয়।

শিশু ভোলানাথের খেলা-পাগল শিশুটির মনের কোন অচিন তারে হঠাৎ ঘা পড়ে। খেলা ভুলে সে বসে বসে ভাবে, "চেয়ে চেয়ে চুপ করে রই – / তেপান্তরের পার বুঝি ওই, / মনে ভাবি ওইখানেতেই / আছে রাজার বাড়ি।"

কবিতায় সেই অদৃশ্য রাজার উপস্থিতি ছেয়ে থাকে, বালক অদেখা রাজবাড়িতে যাবার উপায় খোঁজে।

"থাকত যদি মেঘে-ওড়া
পক্ষিরাজের বাচ্ছা ঘোড়া,
তকখুনি যে যেতেম তারে
লাগাম দিয়ে ক'ষে।"

জীবনস্মৃতির ছোট্ট রবি বড় স্পষ্ট ছায়া ফেলে যায় এ কবিতায়।

ছোট্ট রবি বড় হয়, বালক থেকে তরুণ, পূর্ণযুবক। সৃষ্টিসুখের উল্লাসে রচনা হতে থাকে বিপুল সাহিত্য সম্ভার। কাব্য, নাটক, গল্প, উপন্যাস, গান, গীতিনাট্যে সরস্বতীর ভান্ডার উপচে পড়ে। সে এক অলোকসামান্য জীবন, রূপকথার সৃষ্টি।

ঠাকুরবাড়ির সদস্যরা বরাবরই নাটক নিয়ে উৎসাহী। বাড়িতেই স্টেজ তৈরী করে নাটক, গীতিনাট্যের অভিনয় করেন। গীতিনাট্য লিখে দেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারীরা। একটু বড় হতেই রবির কাঁধে সে দায়িত্ব পড়ল। নতুন আঙ্গিকের নাটক, গীতিনাট্য সৃষ্টি করে রবীন্দ্রনাথ সবাইকে চমকে দিলেন।

"রুদ্রচন্ড" নাটকটি লেখার সময় তাঁর বয়েস কুড়ি। তারপর একের পর এক সৃষ্টি হয়েছে "প্রকৃতির প্রতিশোধ", "নলিনী", "রাজা ও রাণী", "বিসর্জন", "ডাকঘর" ও "অচলায়তন"। দীর্ঘ জীবনে প্রায় ত্রিশটি নাটকের নাট্যকার তিনি। "ফালগুনী", "অরূপরতন", "মুক্তধারা" তাঁর পরিণত বয়েসের সৃষ্টি। রূপকধর্মী লেখায় নাটকের একটা আলাদা ঘরানাই তিনি তৈরী করে দিলেন, যা সেসময়ের সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকগুলির থেকে একেবারেই আলাদা। রূপকের হাত ধরেই তাঁর নাটকে এসেছে রাজার চরিত্র। এক এক জায়গায় রাজার এক এক রকম রূপ। কখনো তিনি বিমূর্ত, অধরা। মঞ্চের আড়ালে থেকে নিয়ন্ত্রণ করেন। কখনো তিনি মঞ্চের প্রধান চরিত্র। অন্য কুশীলবরা তাঁকে ঘিরে আবর্তিত হয়।

জলন্ধরের রাজা বিক্রমদেব, তাঁর রানি সুমিত্রাকে নিয়ে লেখা হল নাটক "রাজা ও রাণী"। রূপকথার রাজা-রানি নয়, বিক্রমদেব ও সুমিত্রা দুজনেই জাগতিক চরিত্র। নিতান্তই রক্তমাংসের মানুষ। বিক্রমদেবের প্রেম হল অন্ধ ভালোবাসা, যা একরকম আসক্তিরই নামান্তর। এ প্রেম সুখ দিতে পারে না।

"এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না,
শুধু সুখ চলে যায় –
এমনি মায়ার ছলনা।"

রানি সুমিত্রা রাজাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর নাটকীয় ঘটনার প্রবাহে রাজার আত্মোপলব্ধি হয়। দমবন্ধ করা, শৃঙ্খলিত ভালোবাসার অন্তঃসারশূন্যতা বুঝতে পেরে রাজা হতাশ।

"এই রাজা !
এই কি মহিমা তার ? বৃহৎ প্রতাপ,
লোকবল অর্থবল নিয়ে পড়ে থাকে
শূন্য স্বর্ণপিঞ্জরের মতো, ক্ষুদ্র পাখি
উড়ে চলে যায়।"

"রক্তকরবী" নাটকের রাজাও প্রেমহীন। ভোগবাদী এবং ধনতন্ত্রের প্রতিভূ। নন্দিনীর স্পর্শে নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে রাজার উত্তরণ হয় শাশ্বত প্রেমের জগতে।

কিন্তু যে রাজা থাকেন পর্দার আড়ালে? সামনে আসেন না কখনোই, দেখা যায় না তাঁদের, শুধু উপলব্ধি করা যায়। তাঁরাও সমান ঔজ্জ্বল্যে আলো ছড়ান রবীন্দ্রনাথের লেখায়। মনে পড়ে, "ডাকঘর" নাটকের অমল আর তার রাজাকে? অসুখে ঘরবন্দী, ছোট্ট অমল চারদেওয়ালের মধ্যে থেকেই পথচলতি দইওয়ালার সঙ্গে আলাপ জমায়। কল্পনার পাখায় ভর করে পৌঁছে যায় দেশ বিদেশ। অক্ষরশূন্য সাদা কাগজে তার স্বপ্নের রাজা তাকে চিঠি লিখছেন, "আমি আজকালের মধ্যেই তোমাদের বাড়িতে যাচ্ছি . . .।" অমলের কল্পনার রাজার একটি ডাকঘর আছে। সেখান থেকে ডাকহরকরা বয়ে নিয়ে আসে রাজার চিঠি। যা আসলে অসীমের আহ্বান, বন্ধন থেকে মুক্তির আহ্বান। অস্তিত্বহীন রাজা এখানে রূপক। গল্পের ক্লাইম্যাক্স আসে রাজার চিঠির মধ্যে দিয়ে।

"রাজা" নাটক রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের সৃষ্টি। প্রকৃতই সাংকেতিক নাটক। রাজাকে নির্মাণ করেছেন শুধুই উপলব্ধির মাধ্যমে। রানি সুদর্শনা রাজাকে খোঁজেন বাইরে। কিঙ্করী সুরঙ্গমার অনুসন্ধান অন্তরে, "যেখানে প্রভু স্বয়ং আসিয়া আহ্বান করেন।" রাজার অস্তিত্ব শুধুই চেতনায়, যে যেমন ভাবে তাঁর রূপটি দেখে, তিনি তার কাছে তেমনই। রাজা কুশের বৌদ্ধ কাহিনি ছায়া ফেলে যায় এ নাটকে।

এবার তাঁর লেখা গল্পগুলির দিকে একটু তাকানো যাক।

লিপিকা গল্পগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের ছোট্ট ছোট্ট গল্পগুলি সংকলিত হল। বেশ কয়েক বছর ধরে রবীন্দ্রনাথ গল্পগুলি লিখছেন, পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। সময়ের হিসেবে মুক্তধারা নাটক ও লিপিকা গল্পগ্রন্থ সমসাময়িক। সংক্ষিপ্ত পরিসরে অনুপম গল্পগুলি বড় গভীর কথা বলে।

"তোতাকাহিনি" গল্পের রাজার আদেশ, তোতাপাখিকে শিক্ষা দিতে হবে। বিস্তর মানুষ মহা কোলাহলে শিক্ষার আয়োজনে ব্যস্ত হল। কোষাগার থেকে দেদার টাকা খরচে রাজা কার্পণ্য করলেন না। তোতাপাখির পেটে রাশি রাশি কাগজ ঠেসে দেওয়া হল। অচিরেই পাখির ভবলীলা সাঙ্গ। শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে খবর পেয়ে "রাজা পাখিটাকে টিপিলেন, সে হাঁ করিল না, হুঁ করিল না। কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খস্‌খস্‌ গজগজ করিতে লাগিল।" শিক্ষার প্রহসন! রাজাকে মাধ্যম করে গল্পকার কী নির্মম সত্যের প্রতিষ্ঠা করলেন!

"বিদূষক" গল্পের রাজা একেবারেই রক্তমাংসের রাজা। যুদ্ধ করে রাজ্যজয় করেন, বলির রক্তে পুজো দেন, হাতির পিঠে ধনরত্ন চাপিয়ে ফেরার সময় দেখতে পান ছেলেরা আমবাগানে খেলছে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা। সে খেলায় রাজার হার! এতবড় আস্পর্ধা! লাগাও বেতের বাড়ি! জ্বালিয়ে দাও গোটা গ্রাম! আদেশমতই কাজ হয়। শুধু রাজার বিদূষক হাসতে ভুলে যায়। এ ছবি যে বড্ড চেনা! দুনিয়াজুড়েই এমন রাজার রাজত্ব!

সবার শেষে রবীন্দ্রনাথের গানের পালা। আর কিচ্ছুটি না লিখলেও তাঁর গানে গানেই আমাদের ভুবন ভরে থাকত। গানেই তিনি খুঁজে পেলেন তাঁর রাজাকে। সেই শৈশব থেকে যাকে খুঁজে চলেছেন, তাঁর পরশ পেলেন। সে পরশমণি ছুইঁয়ে দিলেন আমাদের প্রাণে।

সেই মহামহিম রাজা বিরাজ করেন অন্তরে, "হৃদয়পুরমাঝে"। বিস্ময়ে চেয়ে থাকেন কবি। কোটি চন্দ্র-সূর্যের প্রভাকে হার মানানো এ কী উজ্জ্বল রূপ!

"মহারাজ, এ কী সাজে এলে হৃদয়পুরমাঝে
চরণতলে কোটি শশী সূর্য মরে লাজে"

রাজার উপলব্ধির চেতনায় বাতাস হয় মধুময়, দেহমন বীণার মত বেজে ওঠে, অতীন্দ্রিয় পুলকে ভরে যায় চরাচর। চেয়ে চেয়ে আশ মেটে না।

"পলক নাহি নয়নে, হেরি না কিছু ভুবনে
নিরখি শুধু অন্তরে সুন্দর বিরাজে . . ."

কখনো কবির উপলব্ধিতে আমরা সবাই একাত্ম হয়ে যাই সেই শাশ্বত রাজাটির সঙ্গে:

"আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী শর্তে
আমরা সবাই রাজা !"

উচ্চাসনে নয়, রাজা নেমে আসেন সমতলে। কবিই যে রাজার প্রেমের, আনন্দের আধার, কবিকে ছাড়া রাজারও অস্তিত্ব মূল্যহীন।

"আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হত যে মিছে।"

"যুগল-সম্মিলনে" রাজা আসন পাতেন কবির ঠিক পাশটিতে।

"তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে
তব আমার হৃদয় লাগি
ফিরছ কত মনোহরণ-বেশে
প্রভু, নিত্য আছ জাগি।"

সেই কোন শৈশবের খোঁজা আজ পূর্ণতা পেয়েছে। রাজার বাড়ির ঠিকানা কবি খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু সে বাড়িতে একলা চরণ ফেলেননি, তার চাবিকাঠিটি পরম মমতায় ভাগ করেছেন আমাদের সঙ্গে। গান একসময় শেষ হয়, কিন্তু আমাদের চেতনায় জেগে থাকেন কবির হৃদয়ের রাজা, আত্মার পরমাত্মীয়, শাশ্বত অনির্বাণ হয়ে।

গৌরী মৃণাল

ছিন্নপাতার সাজাই তরণী

অদূর অতীতে আমাদের বাসস্থান পরিবর্তনের একটা পরিস্থিতি এসেছিল। দুর্বিষহ গরম পড়েছিল সেবার, তায় আসবাব থেকে শুরু করে তৈজসপত্র – সব কিছুকেই মুহুর্মুহু টানাহেঁচড়া করা এবং অতঃপর সযত্নে বাক্সবন্দী করা (প্যাকার্স অ্যান্ড মুভার্স এর সৌজন্যে হলেও) – মোটেই কিছু স্বস্তিকর ব্যাপার নয়। তবু সেই দক্ষযজ্ঞের আড়ালেও লুকিয়ে থাকা একটা অন্ততঃ শুভদিক দেখতে পেলাম। অতি প্রিয় অথচ পুরোনো হবার কারণে আর সময়ের অপ্রতুলতায় যেসব বইগুলো তাকের পিছনে চলে গিয়েছিল, তারা আবার বাইরে এলো। নতুন করে ধুলো ঝেড়ে তাদের করপাত্রে তুলে নিলাম। সে যেন নিঃশ্বাস ফেলে হৃদয়ের কানে বলে উঠল – এই তো আমি! এইখানে, একেবারে এইখানেই। কেমন করে ভুলে ছিলে আমাকে, কেমন করে ? যেন গেয়ে উঠল –

বাহির পথে বিবাগি হিয়া কিসের খোঁজে গেলি
আয় আয় রে ফিরে আয়।
পুরানো ঘরে দুয়ার দিয়া ছেঁড়া আসন মেলি
বসিবি নিরালায়।।

"ছিন্নপত্রাবলী" আমার কাছে অমনই এক অত্যাগসহন অবলম্বন। আজকাল stress- buster বলে বিশেষ অভিধায় চিহ্নিত কিছু বইএর প্রবল চাহিদা আর কাটতি। "ছিন্নপত্রাবলী" জীবনের এক একটি দুর্বহ সময়ে সেইসব অলীক ছায়া সরানোর কাজটি আমার জন্য নিভৃত মমত্বে করেছে বারবার। দার্জিলিং দিয়ে শুরু করে বোলপুর হয়ে কখনো সাজাদপুর, শিলাইদহ, আবার কখনো কটক, পতিসর, কালীগ্রাম থেকে কলকাতা – রবীন্দ্রজীবনের এক দীর্ঘ সময় ব্যাপী স্বেচ্ছার্পিত অন্তরিন যাপনএর গভীর উপলব্ধি আর সৃজনের স্বরলিপি "ছিন্নপত্রাবলী"।

জলপথে নিরন্তর একা ভেসে যাওয়ার (কিছু যতিচিহ্নসমেত অবশ্য) এই নেপথ্যে কি ছিল তাঁর বিশ্বমানব হয়ে ওঠার মানসিক প্রস্তুতি? বোয়ালিয়া থেকে লিখেছেন – "আমরা যখন খুব বড়ো রকমের আত্মবিসর্জন করি, একটা মহৎ আবেগে আমাদের তুচ্ছ ক্ষণিক জীবনটা আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তার সুখ দুঃখ আমাদের স্পর্শই করতে পারে না, আমরা সুখদুঃখের চেয়েও বড়ো, আমরা নিত্য নৈমিত্তিক তুচ্ছ বন্ধন থেকে মুক্ত"।

সাজাদপুরে জমিদারী কাজকর্মের তদারকি করতে গিয়ে প্রজাদের নিয়ে লিখলেন – "এই সমস্ত ছেলেপিলে গোরু-লাঙল – ঘরকন্যাওয়ালা সরলহৃদয় চাষাভুষোরা আমাকে কি ভুলই জানে ! আমাকে এদের সমজাতি মানুষ বলেই জানে না। আর সেই ভুলটি রক্ষে করবার জন্যে কতো সরঞ্জাম রাখতে এবং কতো আড়ম্বর করতে হয়। বোট থেকে কাছারি পর্যন্ত আমি হেঁটে আসবার প্রস্তাব করেছিলুম, নায়েব বিজ্ঞভাবে বললেন – কাজ নেই! আমাকে এখানকার প্রজারা যদি ঠিক জানত, তাহলে আপনাদের একজন বলে চিনতে পারত, সেই ভয়ে সর্বদা মুখোশ পরে থাকতে হয়। Prestige মানে হচ্ছে মানুষ সম্বন্ধে মানুষের ভুল বিশ্বাস !" ..... আজকের দিনের অহংসর্বস্ব এই আমরা ভাবতে পারি সে কথা !

রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য প্রখ্যাত লেখক প্রমথনাথ বিশী উচ্ছ্বসিত ছিলেন "ছিন্নপত্র" নিয়ে, – তাঁর মতে, ছিন্নপত্রের নায়িকা হচ্ছে বাংলাদেশের উপর দিয়ে বহমানা তারুণ্যোচ্ছল পদ্মানদী, আর নায়ক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। প্রায় সোয়া শত বছর আগে ৩ জুলাই শিলাইদহ থেকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন এক বর্ষাঘন দিনে – "কাল সমস্ত রাত তীব্র বাতাস পথের কুকুরের মত হূহু হূহু করে কেঁদেছিল – আর বৃষ্টিও অবিশ্রাম চলছে .....।" এরপর লিখছেন, "চাষারা ও পারের চর

থেকে ধান কেটে আনবার জন্যে ..... একখানা কচুপাতা মাথার উপর ধরে ভিজতে ভিজতে খেয়া নৌকোয় পার হচ্ছে – বড়ো বড়ো বোঝাই নৌকোর মাথার উপর মাঝি হাল ধরে বসে বসে ভিজছে – আর মাল্লারা গুণ কাঁধে করে ডাঙার উপর ভিজতে ভিজতে চলেছে – এমন দুর্যোগ তবু পৃথিবীর কাজকর্ম বন্ধ থাকবার জো নেই।"

পরদিন ৪ঠা জুলাই ১৮৯৩ বৃষ্টি বিদায় নিয়েছিল, রোদ্দুর উঁকি দিয়েছিল, কিন্তু আকাশে এত মেঘ ছিল যে, "ঠিক যেন মেঘের কালো কার্পেটটা সমস্ত আকাশ থেকে গুটিয়ে নিয়ে এক প্রান্তে পাকিয়ে জড়ো করেছে, এখনই একটা ব্যস্তবাগীশ বাতাস এসে আবার সমস্ত আকাশময় বিছিয়ে দিয়ে যাবে, তখন নীলাকাশ ও সোনালি রৌদ্রের চিহ্নমাত্র দেখা যাবে না।"

কিন্তু এমন কাব্যিক উপমা টানার পরই কবির চোখে পড়ল চাষীদের নৌকা বোঝাই করে কেটে নিয়ে আসা কাঁচা ধান, কবি লিখছেন, "আমার বোটের পাশ দিয়ে তাদের নৌকো যাচ্ছে আর ক্রমাগত হাহাকার শুনতে পাচ্ছি – যখন আর কয়দিন থাকলে ধান পাকত তখন কাঁচা ধান কেটে আনা চাষার পক্ষে যে কী নিদারুণ তা বেশ বুঝতেই পারা যায়। যদি ঐ শিষের মধ্যে দুটো চারটে ধান একটু শক্ত হয়ে থাকে এই তাদের আশা। প্রকৃতির কার্যপ্রণালীর মধ্যে দয়া জিনিসটা কোনো এক জায়গায় আছে অবশ্য, নইলে আমরা পেলুম কোথা থেকে – কিন্তু সেটা যে ঠিক কোনখানে খুঁজে পাওয়া শক্ত। এই শতসহস্র নির্দোষ হতভাগ্যের নালিশ কোনো জায়গায় গিয়ে পৌঁচচ্ছে না, বৃষ্টি যেমন পড়বার তেমনি পড়ছে, নদী যেমন বাড়বার তেমনি বাড়ছে .....।

লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, বর্ষার নদীকূল ও জলের সখ্য তাঁকে কাব্যিক করে তুললেও শুধুমাত্র সেই কল্পনাবিলাসেই বন্দী থাকেননি রবীন্দ্রনাথ, জীবনের কঠোর বাস্তবতাকেও দেখতে পেয়েছিলেন। ছিন্নপত্রের অনেক চিঠির মধ্য দিয়ে শ্রমজীবী গ্রামীণ মানুষের প্রতি তাঁর সেই একান্ত সমমর্মিতা প্রকাশ পেয়েছে। তাই কি পরে লিখতে পেরেছিলেন –

যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।।

পাঁচই অক্টোবর ১৮৯৫ তে কুষ্টিয়া থেকে যা লিখেছেন তা আমাদের আজকের আত্মকেন্দ্রিক, ভোগসর্বস্ব আধুনিক জীবনের সম্পূর্ণ বিপরীত কেন্দ্রে অবস্থিত। "Goethe এর একটা কথা আমি মনে করে রেখে দিয়েছি – সেটা শুনতে খুব সাদাসিধে, কিন্তু আমার কাছে বড়ো গভীর বলে মনে হয়।

Entbehren sollst du, sollst entbehren.
Thou must do without, must do without.

হৃদয়ের প্রাত্যহিক পরিতৃপ্তিতে মানুষের কোন ভালো হয় না, তাতে প্রচুর উপকরণের অপব্যয় হয়ে আয়োজনেই সময় চলে যায়। বাইরের সুখস্বাচ্ছন্দ্য জিনিসপত্রও আমাদের অসাড় করে দেয়। সেই জন্যে কলকাতার অপেক্ষায়কৃত স্বাচ্ছন্দ্য আমাকে অল্পকালের মধ্যেই পীড়ন করতে থাকে, সেখানকার ছোটখাটো সুখসম্ভোগের মধ্যে আমার যেন নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে।" ..... এই ভোগপীড়িত, আয়োজন – লাঞ্ছিত পৃথিবীর কোলে এমন কথা আমাদেরই একজন বলে গিয়েছেন এই কিছুদিন আগে, ভাবলে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। আজ এই মুহূর্তে চারিদিকের অশান্ত, দীর্ণ মানুষকে পৃথিবীও কি তাই বলছে না! –

Thou must do without, must do without.

আর একটি চিঠি, কালীগ্রাম থেকে লেখা, যতবারই পড়ি, মনকে এক অসীম শান্ত মাধুর্যে শুশ্রূষা করে যেন অধিকার করে নেয়।

"ঐ যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালোবাসি ..... মনে হয় পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি, এমন কি কোনো স্বর্গ থেকে পেতুম? স্বর্গ আর কি দিত জানি নে, কিন্তু এমন কোমলতা দুর্বলতা-ময়, এমন সকরুণ আশঙ্কা ভরা এই মানুষগুলির মতো এমন আদরের ধন কোথা থেকে দিত! আমাদের এই মাটির মা, আমাদের এই আপনাদের পৃথিবী, এর সোনার শষ্যক্ষেত্রে, এর স্নেহশালিনী নদীগুলির ধারে, এর সুখদুঃখময় ভালোবাসার লোকালয়ের মধ্যে মর্ত্য হৃদয়ের অশ্রুর ধনগুলিকে কোলে করে এনে দিয়েছে। এই জন্যে স্বর্গের উপর আড়ি করে আমি আমার দরিদ্র মায়ের ঘর আরো বেশি ভালোবাসি।" পৃথিবীর প্রতি দুর্মর সেই ভালোবাসার কথা তাঁর গানে কবিতায় অবিরল বাণীবদ্ধ করে গিয়েছেন –

"আবার যদি ইচ্ছা করো আবার আসি ফিরে
দুঃখসুখের ঢেউ-খেলানো এই সাগরের তীরে।
..... নূতন প্রেমে ভালোবাসি আবার ধরণীরে।"

স্বপ্না চৌধুরী

তোমার গানে

মানবতার কবিকে আমরা কতভাবে দেখি! সাধক-কবি, প্রকৃতিপ্রেমিক-কবি, স্বাধীনতারপূজারী-কবি এবং সর্বোপরি প্রেমের কবি। ঈশ্বরপ্রেম মানবপ্রেম একাকার তাঁর গানে। প্রেম সর্বকালীন সর্বত্রগামী। কিন্তু সে আসবে 'মহা সমারোহে' এ ভাবে কি কেউ কোনো দিন ভাবতে পেরেছে ! গানটি শুরু হচ্ছে কীভাবে ? 'বিরস দিন বিরল কাজ' সেই গানে তিনি লিখছেন, 'এসেছ প্রেম এসেছ আজ কি মহা সমারোহে'! প্রেমের সংজ্ঞা দিলেন পাল্টিয়ে।

এই যে ভুবন, তার রূপরঙ ও ভূপ্রকৃতির বৈচিত্র্যে কবিকে চিরমুগ্ধ করে রেখেছে। কতভাবে কত বিচিত্র অনুভূতির সমণ্বয়ে তিনি প্রকাশ করে গেছেন সে কথা ! বলছেন 'বিশ্বজন মোহিছে'! নিজে কোনদিন এ মোহপাশ ছিন্ন করতে পারেননি। তাই তো সুন্দর ভুবনে তিনি বলছেন 'মরিতে চাহিনা আমি'।

পূজা প্রেম প্রকৃতিকে কতবার মিলিয়ে মিশিয়ে নিয়েছেন নিজের মত করে !

আশীর্বাদ চাইছেন 'শ্রাবণের ধারার মত', আনন্দ বসন্ত সমাগমে চাইছেন লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ। রজনীগন্ধার পরিমলে 'সে আসিবে আমার মন বলে / আজি গোধূলি গগনে'।

বসন্তে যখন বেণুবনছায়া হয়েছে মধুর তিনি বসে আছেন না বলা বাণীর আকুলতা নিয়ে, প্রেমিকার ব্যাকুল নয়নে ভাবের খেলা দেখছেন গোপনে।

সুরে সুরে তালে তালে মন্দ্রিত সে গান, সুখে-দুঃখে, হরিষে-বিষাদে, শোকে-উৎসবে, বেদনায়-উচ্ছ্বাসে সে গান চর্চিত। উদ্দীপনায় অন্তর্লীনতায় অনুপ্রেরণা সে গান। 'রাত্রি যেথায়' 'দিনের পারাবারে' এসে মেশে সেইখানেতে 'ভুবনজোড়া আসনখানি' পেতে রেখেছেন সেই মানবপুত্র। তিনি রবীন্দ্রনাথ। তাঁর গান বাস্তব চিত্রকল্পকে মিলিয়ে দেয় অতীন্দ্রিয় ভাবজগতের সঙ্গে। ভুবন-দোলানো জোয়ার-ভাঁটা ইঙ্গিত দেয় অসীমকালের। জানার মধ্যে নিত্য চলে তাঁর অজানার সন্ধান। 'আকাশভরা সূর্যতারা'য় তিনি পেয়ে যান এই বিশ্বে এক মহাসন।

লিখলেন,

"একেলা যেতেম যে প্রদীপ হাতে নিবেছে তাহার শিখা
তবু জানি মনে তারার ভাষাতে ঠিকানা রয়েছে লিখা।"

এই মহাকাশ তার অসীম রহস্য নিয়ে বিস্ময়ে সদা জাগ্রত রেখেছে কবিকে। বারবার তাই আকাশ মহাকাশ ও তারারা এসেছে তাঁর রচনায়।

তাঁর সাধনা অচেনাকে চেনার। অজানার জয়গাথা তাঁর গান। অচলায়তনের দুয়ার ভেদ করে, দ্বিধা ত্রাস অলস-নিদ্রা ত্যাগ করে দীপ্ত বিজয়কেতু উড্ডীন তাঁর গানে। নূতনের ডাকে বিঘ্নবিপদ দুঃখদহন মৃত্যুগহন পার করার মাভৈঃ বাণী সে গান। যা ভাঙল তার দিকে না ফিরে না ফিরে বেঁচে ওঠার বিজয়মন্ত্র 'ভাঙনের জয়গান গাও, ভাঙনের জয়গান গাও'।

"ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়
তোমারি হউক জয়!"

সুজয় দত্ত

আমার কবি

সবার যিনি রবীন্দ্রনাথ, তিনিই আমার প্রাণের কবি।
দেড়শো বছর পেরিয়ে এসেও হয়নি মলিন তাঁর যে ছবি
এই বাঙালীর হৃদয় জুড়ে – তাতেই পরাই পুষ্পমালা।
তাঁর বেদীতেই অঞ্জলিদান, নিত্য পূজার প্রদীপ জ্বালা।

বিশ্বজগৎ মুগ্ধ হয়ে বরণমালা পরায় গলে,
তাঁর প্রতিভার আলোয় নেয়ে শ্রদ্ধা জানায় চরণতলে।
যতই পূজি, যতই নমি, যতই রাখি সরিয়ে দূরে –
হিয়ার মাঝে তাঁর বাঁশিটি বেজেই চলে আপন সুরে।

অনেক দূরের দেবতা নন, তিনি আমার আপন সখা।
দুঃখে সুখে পরম সুহৃদ, আঁধার রাতে আলোকরেখা।
তাঁর পরশে জুড়ায় জ্বালা, তাঁর পরশে পুলক জাগে,
তাঁর লেখনীর জাদুর ছোঁয়ায় জীর্ণ জীবন মধুর লাগে।

ছিন্ন আশা, ভগ্ন স্বপন চিত্তে যখন দহন জ্বালে –
জানি "এ-ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে"।
কিংবা যখন অশান্ত মন, কে যেন গায় বুকের মাঝে –
"অশান্তি যে আঘাত করে, তাইতো বীণা এমনি বাজে"।

গ্রীষ্ম আসে, বর্ষা আসে, আসে শরৎ-হেমন্ত-শীত।
তাদের নিয়ে কে আর রচে এমন মধুর অমৃতগীত ?
পথভোলা কোন পথিক এসে চামেলি আর মল্লিকাকে
বসন্তেরই উতল হাওয়ায় ডাক দিয়ে যায় পথের বাঁকে ?

জগৎজোড়া প্রেমের ফাঁদে কে যে কোথায় পড়ছে ধরা !
ভালবাসা কারে যে কয় – সে কি শুধুই রোদনভরা ?
চোখেই যারে দেখিনি হায়, বাঁশি শুনেই সোঁপেছি প্রাণ,
সেই আমারে কাঁদায়-হাসায় – অশ্রুসজল আনন্দগান।

রবি গেছেন অস্তাচলে – এ-যাওয়া নয় তেমনি যাওয়া।
অন্তরে তাঁর নিভৃত নীড়, নিত্য সেথায় আসাযাওয়া।
"ভুবনজোড়া আসনখানি" হৃদয়-মাঝে থাকবে পাতা –
তাঁর সুরে মোর কণ্ঠ মুখর, তাঁর বাণী মোর মর্মে গাঁথা।

ইন্দিরা চন্দ

অমৃতের খোঁজে

"জীবনে পরম লগন করো না হেলা"
শ্যামার আঁচলে উত্তীয়র মলমল
বজ্রসেনের দামি রেশম
ধুলায় গড়াগড়ি ...
শ্যামা বলে,
ভালবাসার পূর্ণতা আত্মবলিদানে না ক্ষমায় ?
নিষ্ঠুরতায়, ছলনায় ভালবাসা বুঝি চঞ্চল
কখন হাত ফসকে পালায় ...

"চুরির ধন আমার দিব ফিরায়ে ..."
তাই তো ফিরিয়ে দিলাম সব
সব মোহ, সব আভরণ, সব অঙ্গ সজ্জা
ফেলে দিয়ে অন্তরের সৌন্দর্যের পূর্ণ বিকাশ
সে আমি এক পরিপূর্ণ নারী, আমি চিত্রাঙ্গদা

সন্ধ্যার প্রদীপ শিখা হাতে প্রকৃতির যাত্রা
অস্পৃশ্যতার শৃঙ্খল পার করে ভালবাসার
বন্ধনের খোঁজে
বৈরাগ্যের গেরুয়া আকাশের লালিমাকে
আরো গাঢ় করে
নেমে আসে মাটিতে, প্রকৃতির মনে
ত্যাগ, ক্ষমা না শান্তি কিসে নিভবে সেই
রক্তিম পিপাসা ?

মায়ায়, ছলনায়, নিষ্ঠুরতায়, হতাশায়
জীবন যন্ত্রনার বীজ
ফিরে ফিরে আসে
খুবলে নেয় চোখ, উপড়ে নেয় নখ, নিঃস্ব
করে দেয়
ব্যথায় নীল হয়ে যায় আকাশ
আর সেই নীল আকাশেই লাল সূর্য উষ্ণতা
এনে আলো ছড়ায়

শ্যামারা পারেনি, প্রকৃতি কি চেয়েছিল ?
বোধহয় চায়নি।
চিত্রাঙ্গদারা সাহসি ...
সাহস আর ভয় হাত ধরাধরি করে পথ চলে
মিলন আর বিচ্ছেদের মতো, ত্যাগ আর
ভোগের মতো
ওদের সাথে আমরাও চলি ...
ভালবাসার অমৃতের খোঁজে

তপনজ্যোতি মিত্র

পথের শেষ কোথায়

অমল – কে যেন ডেকে উঠল !
হাওয়ার মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছিল সেই ডাক, কী আর্তিময় সেই ডাক ।

অমল তখন মেশিনে কাজ করে ক্লান্ত ।
প্রতিদিন বাড়ির থেকে অনেক দূরে এই কারখানায় কাজ করতে আসতে হয় তাকে ।

তবু অমলের একটা সুন্দর অভ্যাস আছে।
কাজের ফাঁকে ফাঁকে বই পড়া ।

ট্রেনে কোনোদিন বসার জায়গা পেলে তখনো বসে সে বই পড়ে।
মাঝে মাঝে চোখ তুলে দূর দিগন্তের দিকে তাকায় –
আদিগন্ত শস্যক্ষেত্র,
উড়ে যাওয়া পাখিমালা,
দূরে দীর্ঘ গাছেদের সারি।
এসব দৃশ্য অমলের মনকে ভরিয়ে দেয় ।

আজ অমল পড়ছে কবির বই "লিপিকা" থেকে "পায়ে চলার পথ",
পড়তে পড়তে অমলের মনটা এক অপূর্ব অনুভবে ভরে গেল – বিশেষ করে কবি যেখানে লিখেছেন –
"এই পথটি বহু বিস্তৃত পদচিহ্নের পদাবলী, ভৈরবীর সুরে বাঁধা"

অমলের অনেক পুরনো স্মৃতি মনে পড়ছিল,
বাবা-মা বহুদিন আগেই চলে গেছেন,
তবু তাঁদের স্মৃতি ফিরে ফিরে আসছিল, ফিরে আসছিল আরো অনেক স্মৃতি।
অমল তখন পথের কথা ভাবল ।

কাজ শেষ করে অমল বাইরে এসে দেখল – জনারণ্যে কী ভিড় !
কি হয়েছে ভাইরা – অমল জিজ্ঞাসা করল।
কবি চলে গেছেন অনন্তের পথে – কে যেন বলল ।
অমলের মাথাটা দুলে উঠল ।

তার তো এই অতিসাধারণ, অকিঞ্চিৎকর জীবন,
সেই জীবনে নেই কোনো বিস্ময়, কোনো গরিমা,
তবু কিভাবে যেন সেই কবি তার কাছে খুলে দিয়েছিলেন এক অপার রহস্যময় পৃথিবীর দরোজা।

যেখানে ভালোবাসার আবাহন এক অনন্ত গোধূলি উদ্ভাসের মতো জেগে আছে।

অমল পায়ে পায়ে নদীর পাড়ে এসে দাঁড়ালো,
আর কিছুক্ষণ পরে কবি মিলিয়ে যাবেন অনন্তে,
তবু থেকে যাবে তাঁর গানের কথাকলি, তাঁর কবিতা গল্প নাটক উপন্যাসের পৃথিবী, তাঁর আঁকা ছবির আলো – আঁধারির ছায়াপথ ।

তখন অনেক দূরে এক মফস্বল শহরে সুধা দাঁড়িয়ে রয়েছে তার ঘরের জানালার কাছে,
আজ অরন্ধন ।
আর শুধুই কষ্ট অনুভবের দিন,
জীবনকে স্পর্শ করার দিন।

সুধা তার ডায়েরি খুলল।
যেখানে লেখা আছে না পাঠানো অনেক চিঠি।
কোনোটা অমলকে লেখা,
কোনোটা বা প্রিয় কবিকে।
এসব চিঠি তার বড় আপন, তার একটুকরো আকাশ, তার গোপন অনুভূতিমালা।

এইরকমই এক চিঠি সুধা আজ পড়তে শুরু করল –

প্রিয় কবি
অনন্তের কাছে চলে গেছে যে সীমারেখা
সেই রেখাকে যেদিন তুমি স্পর্শ করবে
সেদিন সমস্ত হৃদয়ে ঝরে পড়বে অঝোরা বৃষ্টি

সেই বৃষ্টির উতলা হাওয়া এসে আছড়ে পড়বে কাঁচঘরে,
কাঁচঘরের মানুষেরা তোমাকে অনুভব করবে,
তোমার চেতনা, তোমার অসীম, তোমার দিনরাত্রির অনুভব – সবকিছুকে ধারণ করে জেগে থাকবে মানুষের মহাপৃথিবী।

হারিয়ে যাওয়া ডাকবাক্সরা ফিরে আসবে,
না পৌঁছানো চিঠিগুলো আবার ফিরে এলে
অজস্র স্মৃতিকণাদের কলকাকলিতে ভরে যাবে মানুষের হৃদয়।

তারপর সেই বৃষ্টির অঙ্গন থেকে মানুষেরা আবার পঁচিশে বৈশাখের কথা ভাববে।
পঁচিশে বৈশাখ থেকে বাইশে শ্রাবণ আর বাইশে শ্রাবণ থেকে আবার পঁচিশে বৈশাখ –
এই আবর্তনই ত হয়ে থাকবে তার চিরকালীন তীর্থপথ।

তোমায় ভুলবো না কবি।

ইতি
তোমার সুধা

কান্নাভেজা পথে সুধার তখন "লিপিকা"র সেই লাইনটা মনে পড়ছে –
"পথ কি নিজের শেষকে জানে ?"

সুধা ডাকল – অমল, "পথের শেষ কোথায়, কি আছে এই পথের শেষে ?"

নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা সেই আর্ত মানুষটা কি শুনতে পেল বহুদূর থেকে ভেসে আসা করুণ সেই ডাক ?
কে যেন তাকে ছুঁয়ে বলল –
"অমল, সুধা তোমাকে ভোলেনি।"

তখন সে কোন কান্নার দহন, সে কোন বেদনার আর্তি, সে কোন বিষণ্ন ভৈরবীর মল্লার –
লণ্ঠন আলোয় অপরূপ মায়াবী রূপকথা হয়ে থাকছিল।

সৌমিত্র চক্রবর্তী

মানুষের ওপর...

যা হওয়ার, তাই হলো।
আমি আপনাকে হারিয়ে ফেললাম।
আমি আসলে সিঁড়ি চড়ছি অনেকদিন,
সাফল্যের সিঁড়ি।
মাধ্যমিক সিঁড়ি, উচ্চ মাধ্যমিক সিঁড়ি,
কলেজ কেরিয়ারের সিঁড়ি।
আর আপনি তো জানেনই
সিঁড়ি চড়তে গেলে একাগ্র হতে হয়,
সিঁড়ি চড়তে গেলে অন্য কিছুতে মন দিলে চলেনা,
সিঁড়ি চড়তে গেলে অনেক কিছু ভুলে যেতে হয়।
তাই আপনাকেও ভুলে গেলাম।
ভুলে গেলাম ছোট্টবেলায়
মা গেয়ে শোনাতো আপনার গান,
ভুলে গেলাম ক্লাস সেভেনে
সন্দীপ্তা বড় ভালো আবৃত্তি করেছিলো আপনাকে।
মাধ্যমিকের পর,
বাবা দিয়েছিলো আপনার রচনাবলী।
পড়েছিলাম।
ভুলে গেলাম। তবু,
আজ যখন
ঘুণপোকা কুরে কুরে খায় সিঁড়ি,
লোভ থিকথিক করে কর্নফ্লেক্সের বোলে,
পাতের গ্রিলড চিকেন থেকে অফিসের অধস্তন
সবার ওপরেই নেশার মতো হিংস্র হয়ে উঠি আমি,
অনেক দূর থেকে,
বোধহয় দেশে ফেলে আসা বই-আলমারি থেকে,
ভেসে আসতে থাকে খালি,
"মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ।
মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ।
মানুষের ওপর . . .।"

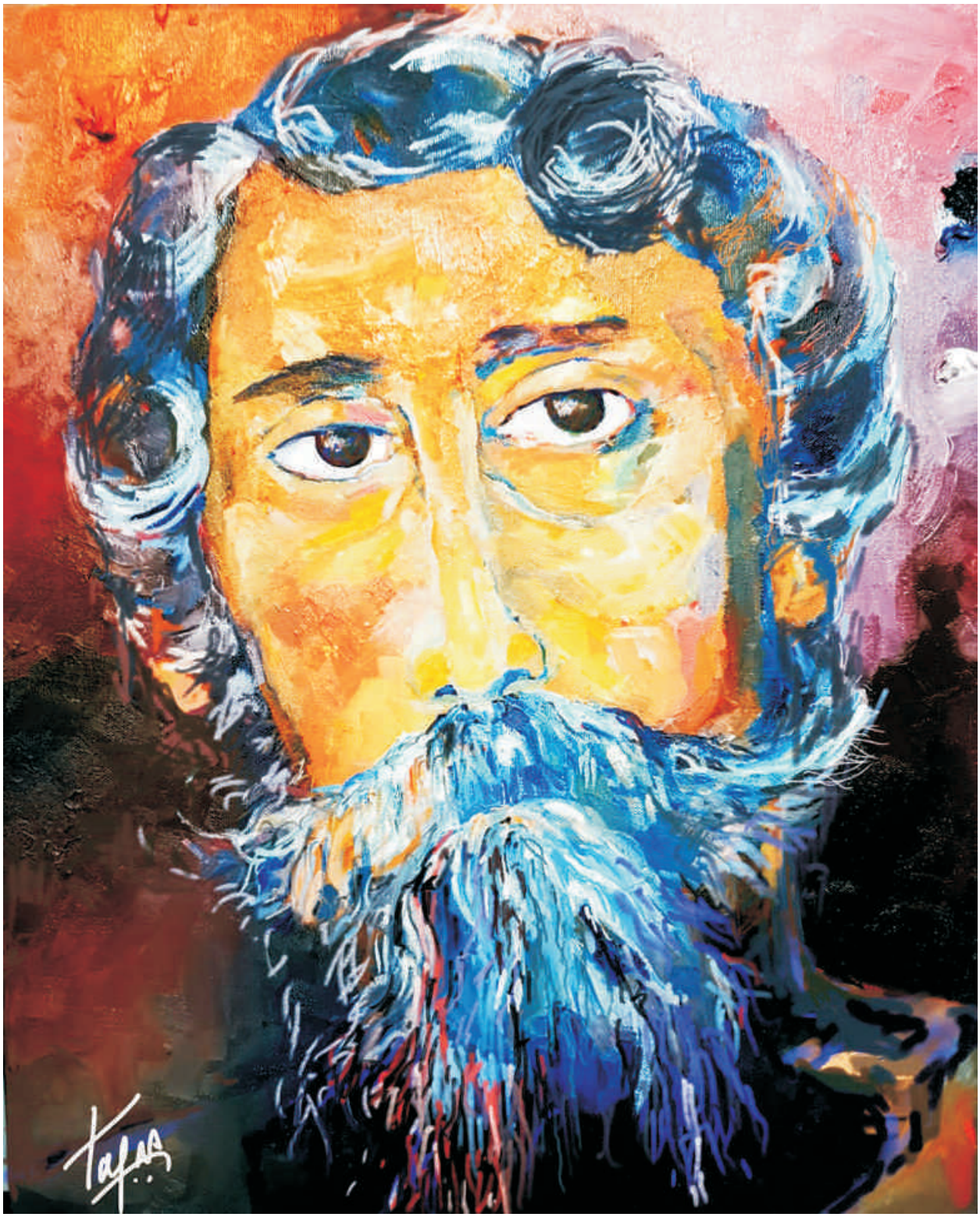

Painting by Tapas Roy, USA

Bhajendra N. Barman

Presence of Rabindranath Tagore in Bangladesh

This overview examines why Rabindranath Tagore (*1861-1941*), who was the *Nobel Laureate in Literature* in 1913, is greatly admired and revered in Bangladesh. It provides, primarily, a description of places where he lived, what he did there, how he experienced and enjoyed the beauty of the countryside, and how he and Bangladesh benefited from his living there. Some major initiatives to memorialize him by preserving buildings and places where he lived and worked are also discussed.

Rabindranath Tagore's song, "*Aamar Sonar Bangla*", written in 1905 has been the national anthem of Bangladesh since its independence in 1971. He wrote this during the first partition of Bengal expressing his feelings about how beloved and beautiful place Bengal was, what he saw there, how she was dear to his heart and mind, and how he would feel if she was scarred.

National anthem of Bangladesh in Bengali

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার
প্রাণে বাজায় বাঁশি॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে –
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো –
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে –
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥

English translation

My golden Bengal, I love you.
Forever your skies, your air set my heart in tune as if it were a flute.
O mother! The aroma of the mango orchard in the spring time drives me crazy,
Ah, what a thrill!
O mother! In late autumn what I see is smile throughout mature fields of paddy.

What a beauty, what shades, what affection, what tenderness!
What a quilt have you spread at the feet of banyan trees and along the bank of every river
Mother, words from your lips are like nectar to my ears.
Ah, what a thrill!
O mother! If sadness casts a gloom on your face, my eyes are filled with tears!

Obviously, Rabindranath Tagore composed the above song after living in a beautiful rural part of Bengal where he could witness six seasons, experienced her natural beauty, and met with and observed keenly the social life of common people. He spent part of his early life, almost full time (from 1889 to 1901), in Bangladesh, specially, in the districts of Kushtia, Pabna and Rajshahi as he was sent there to supervise estates (*Zamindari*) belonging to the Tagore family. He received a power of attorney from his father Maharishi Debendranath Tagore (*1817-1905*) on 8 August 1896 to oversee all their estates in East Bengal. Under his Zamindari, common people received sympathetic attention and because of his disciplined approach, these estates had positive balance sheets and people were found happy.

As a background, Prince Dwarakanath Tagore (*1794-1846*) inherited two estates in Jessore and Pabna of East Bengal after the death of Ramlochan Thakur (his uncle) on 12 December 1807. He also purchased two additional estates from East Bengal and one estate from Cuttack, Orissa between 1830 and 1834. His son, Debendranath Tagore inherited all these estates after his death on 1 August 1846.

We note that Rabindranath Tagore opposed the division of Bengal that took place on 16 October 1905. For this, initially, he had very little public support. He was mindful of that and for feeling friendless, he wrote a popular song, a portion of which is given below. Ultimately, this partition ended on 12 December 1911 because of its opposition from different corners.

In Bengali:

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে ॥
যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয় ...
তবে পরান খুলে
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে ॥ ...

Prose translation by Rabindranath Tagore:

If no-one heeds your call - then walk alone.
If no-one speaks (to you),
O unlucky one, if everyone turns away, if everyone fears to speak,
then with an open heart without hesitation
speak your mind alone. …

As means of transportation, Rabindranath Tagore had to board on his personal house-boat (*Bajra*), Padma or a steamer. In the dry season, he traveled in a palanquin. All the places he lived were on the banks of major rivers. As one can find from his regular correspondences (*Glimpses of Bengal by Rabindranath Tagore, 1921* and *Selected Letters of Rabindranath Tagore* by K. Dutta and A. Robinson, 1997), he traveled primarily by boat to and from these places, and frequently, from these places to Calcutta (Kolkata). Examples of such travels with dates (found in his correspondences) are shown below. However, these may not be construed as a comprehensive list of all of his travels within the year mentioned on the left-hand side.

1892 4 Jan at Shelidah – 2 May at Bolpur – 21 Jun at Goalunda – 22 Jun at Shelidah – 25 Jun at Shahzadpur – 20 Aug at Shelidah – 18 Nov at Boalia (Rajshahi) – 2 Dec at Natore – 9 Dec at Shelidah.

1993 2 Feb at Balja – 10 Feb at Cuttack (Orissa) – 8 May at Shelidah – 7 July at Shahzadpur – 13 Aug at Patisar.

1994 19 Feb at Patisar – 24 Jun at Shelidah – 5 Sep at Shahzadpur – 20 Sep at Dighapatiya – 22 Sep at Boalia – 5 Oct at Calcutta – 19 Oct at Bolpur – 7 Dec at Shelidah.

Shelidah (Shelaidaha), Kushtia

Shelidah is located in Kumarkhali Upazilla of Kushtia, and it is about 15 kilometers away from Kushtia district-town, which is located on the opposite side of Madhumati river. This estate belonged to Dwarakanath Tagore. It has a *Kuthibari* (country house) built by him. Rabindranath Tagore visited Shelidah on 25 November 1889. He might have visited there with his elder brother Jyotirindranath Tagore (*1849-1925*) in 1876 also. He used the Kuthibari as his primary residence from 1891. After receiving the power of attorney in 1896 to oversee all the estates in East Bengal, he brought his wife and children there in 1898. The family lived there until 1901 when he decided to move to Shantiniketan. His last visit to this place was in 1922.

At Shelidah (also at Shahzadpur in Pabna and Patisar in Naogaon) Rabindranath Tagore composed the literary masterpieces such as *Noukadubi* (*The Boat-Wreck*), *Sonar Tori* (The Golden Boat), *Chitra*, *Chaitali*, *Bishorjon* (The Sacrifice), *Chhinnapatra* and about sixty short stories including Postmaster and *Panchabhoot-er Diary*. He wrote most of the poems in *Naibedya* (*Offerings*), *Kheya*, and many songs in *Gitanjali* (*Song Offerings*) and *Geetimalya* (*Garland of Songs*) at Shelidah. He also translated some of his books in English there. It was Shelidah in 1912, where he started translating Gitanjali into English that earned him the Nobel Prize in literature on 10 December 1913. The justification for this award included *"because of his profoundly sensitive, fresh and beautiful verse, by which, with consummate skill, he has made his poetic thought, expressed in his own English words, a part of the literature of the West"*.

A number of Rabindranath Tagore's short stories and poems were extraordinary in describing social injustice, the pain and sorrows of common people who might have been his subjects under the feudal Zamindary system. Examples of these include (a) "*Shasti*", meaning punishment, is a short story about a family with two brothers having their lives in dire poverty. They had an unintentional murder and faced a court system where one brother at the advice of villagers saved the life of his sibling by forcing his innocent young wife to confess to committing the crime; (b) "*Dui Bigha Jomi*"- a poem on the story of a poor farmer whose meager parcel of farmland with house was taken away by his Zamindar. Rabindranath Tagore's keen

observations and sympathetic tone that were reflected in many of his writings made him a person of humanity and a warrior against social injustice. Obviously, this humanitarian chord of his writings originated from his living among the common people as well as seeing rampant exploitations, indecency, oppression and cruelty from fellow Zamindars.

Rabindranath Tagore was profoundly influenced by several *Baul* and folk singers living close to Shelidah. They used folk musical instruments and sang songs dealing with day-to-day problems, spirituality, humanism, social harmony and peace. Even without having little or no education, they composed hundreds of popular songs. These singers included Lalon Fakir (*1774-1890*) and Gagan Harkara (*1845-1910*).

The only available portrait of Lalon Fakir was sketched by Jyotirindranath Tagore in 1889. Lalon Fakir's *Akhra* (assembly place) was at Cheuriya, about 2 kilometers from Kushtia railway station. It was under Shelidah Zamindari. Rabindranath Tagore was so impressed with Lalon Fakir that he collected 258 of his songs and filled two note books. His song "Aamar praaner maanus achhe praane…" followed the tune of Lalon Fakir's song "Milan hobe koto dine..". Gagan Chandra Dam was a postman at Shelidah post office who delivered to and collected mails from Rabindranath Tagore during his stay at Shelidah. People used to call him "*Harkara*" a Bengali term meaning postman. Rabindranath Tagore composed "Aamar Sonar Bangla" after the tune of Gagan Harkara's song "Ami Kothay Pabo Tare ". Rabindranath Tagore managed to publish a good number of Lalon Fakir and Gagan Harkara songs in the *Probashi* magazine of Calcutta.

Figure 1. Shelidah Kuthibari

Rabindranath Tagore developed and advanced his idea on innovative research in agriculture and rural development and eventually, attempted to implement these in all of his estates. When world was advancing with science and technology, his vision was reflected in his words, "*Science has given man immense power. The golden age will return when it is used in the service of humanity*." To alleviate the suffering of people in the countryside, especially that of poor farmers, he thought of initiating a self-reliant village economy through promoting local initiatives, leadership and self-governance through cooperative systems.

When Tagore estates in East Bengal were divided in 1921, Shelidah estate went to his brother Satyendranath Tagore (*1942-1923*). It was a borrower from a Bank and eventually, it was repossessed by the Bank. It was then auctioned off to the Zamindar of Bhagyakul (Munshiganj), Roy family. The house was part of Roy Estate until the Zamindari system was abolished under the East Pakistan State Acquisition and Tenancy Act of 1950. There was an initiative to preserve the house in 1958. It has now become a visitors' destination.

Shahzadpur, Sirajganj

When Rabindranath Tagore was 29, he came to Shahzadpur, which was then in Pabna district, to supervise his family estate as its Zamindar. He lived there on and off from 1890 to 1895. This location is close to Ichhamati and Atrai rivers. Currently, Rabindra *Kachhari Bari* (Courthouse/ office) at Shahzadpur is preserved as Rabindra Memorial Museum. This museum houses rare photographs, furniture and metal pots. The Rabindra Auditorium, accommodating 500 seats was built there in1999.

Figure 2. Rabindra Memorial Museum at Shahzadpur

Shahzadpur is now the location of *Rabindra University*, launched as the 35th public university of Bangladesh in 2015. According to Rabindra University's declarations, it will receive financial support from both Bangladesh and India. It will offer academic programs for undergraduate and post-graduate courses and research facilities on Rabindranath Tagore's life, philosophy, literature, music, global culture, arts, dance, fine arts, plays, social sciences, agriculture, business administration, law, physical sciences, engineering, technology and some more subjects. Professor Bishwajit Ghosh of the Department of Bengali, University of Dhaka was appointed as the first Vice Chancellor. Students were admitted for the 2017-2018 session and their classes started on 17 April 2017.

Patisar, Naogaon

The *Kachhari* (office complex) of the Tagore family's estate of Kaligram Pargana was located at Patisar, Rajshahi. This estate was purchased in 1830. It is now in the Naogaon district. It is on the bank of Nagor river, at 12 kilometers south-east of Atrai railway station and 26 kilometers from Naogaon.

Rabindranath Tagore first came to Patisar in January 1891. There, the main mansion is a two-story building, called *Kuthibari*. He established a primary school and a High English School, now called Rathindranath High School, named after his son, Rathindranath Tagore (*1888-1961*). He also founded a charitable dispensary and Patisar Krishi Bank. At Patisar, he established a co-operative society for the development of agriculture, handloom, and pottery. A pond near the Kachhari is now called *Rabindrasagar*.

In 1921, when the Zamindari was divided among brothers, Patisar became part of Rabindranath Tagore's share. When he was awarded the Nobel Prize, the residents of Patisar felicitated him with an address of honor in 1913. On the request of his tenants, Tagore visited Patisar in 1937 for the last time.

On the occasions of Tagore's birth and death anniversaries, discussion meetings and cultural functions are held at Patisar.

Figure 3. Patisar Kachhari

Tagore's Father in law's house at Dakshin Dihi, Khulna

Rabindranath Tagore was married to Mrinalini Devi (*1883-1902*, previously known as Bhabatarini on 9 December 1883. She died prematurely on 23 November 1902 at the age of 28. She was memorialized through the restoration of her birth home at Dakshin Dihi village in Khulna. This also serves as the Rabindra Center. There are statues of Rabindranath Tagore and Mrinalini Devi in front of the house, and a stage named Mrinalini Mancha was built under a big tree. This Rabindra complex is used by the local people to organize fairs and to celebrate his birth anniversary.

Visits at the University of Dhaka

The University of Dhaka (Dacca) was opened on 1 July 1921. In 1926, the University of Dhaka invited Rabindranath Tagore to attend a conference called "*The Meaning of Art"*. He was in Dhaka between 7 February and 14 February 1926. He was honored by numerous organizations. He attended receptions that

Figure 4. Old house and restored house

included at Northbrook Hall (*Lalkuthi*), Coronation park on the bank of Buriganga River, Curzon Hall, Salimullah Muslim Hall, Jagannath Hall, Eden Girls School and Intermediate College. He was also invited by the Teachers Association, Students Association, Dipali (an organization for women) and Sahitya Parishad. He had a dinner reception at Curzon Hall organized by then Vice Chancellor, Professor George Harry Langley. The University of Dhaka invited Rabindranath Tagore again in 1936 and he was awarded the D. Lit. degree. At that time, the university had its first Vice Chancellor of Bengali descent, Sir Ahmad Fazlur Rahman.

One interesting note is that Rabindranath Tagore promised and sent a song, "Basantika" written on 13 Falgun 1332 (26 February 1926) to Jagannath Hall students for publishing it in their magazine "*Basanti*".

Basantika in Bengali

এই কথাটি মনে রেখো, তোমাদের এই হাসিখেলায়
আমি যে গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায় ॥
শুকনো ঘাসে শূন্য বনে আপন-মনে
অনাদরে অবহেলায়
আমি যে গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায় ॥

দিনের পথিক মনে রেখো, আমি চলেছিলেম রাতে
সন্ধ্যাপ্রদীপ নিয়ে হাতে।
যখন আমায় ও পার থেকে গেল ডেকে
ভেসেছিলেম ভাঙা ভেলায়
আমি যে গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায় ॥

English translation adapted from Shailesh Parekh:

Amidst all your fun and frolic, do remember the song I
sang when the trees were shedding dry leaves.
In desolate forest, amidst dry grass, to myself,
Neglected and rejected,
The song I sang when the trees were shedding leaves.

O' the traveler of the day, I walked at night
with an evening lamp in my hand.
When I was asked from the other shore,
in my broken raft, I floated away.
(Remember) the song I sang when the trees were
shedding leaves.

At Rajshahi

Rabindranath Tagore was invited to one of the literary functions of the Rajshahi Association.

He read his paper entitled "*Sikshar Herfer*" (Restructuring of Education System) on 12 November 1892. We note that Rajshahi Association was established in 1872 as an organization for the education and welfare of the people. It was founded by Raja Pramathanath Roy Bahadur of Dighapatiya, Rajshahi.

In Rajshahi city, Tagore family had a house on the bank of Padma river. Recently, Rabindranath and Nazrul murals were erected near this house.

Figure 5. Murals of Rabindranath Tagore and Kazi Nazrul Islam (1899-1976)

Other places in Bangladesh visited by Rabindranath Tagore

Rabindranath Tagore can certainly be considered as a well-travelled personality of his generation. On 14 February 1873, at age eleven, he accompanied his father to tour India for several months visiting father's estates, and places including Amritsar in Punjab where they stayed for a month. This trip helped him to be self-disciplined, independent and appreciative of nature. Tagore visited more than 30 countries belonging to five continents.

To our knowledge, exhaustive travel details of Rabindranath Tagore within Bangladesh are not available. However, one may expect that he traveled many parts of the country. He was found to plan each of his trips for multiple locations. For an example, his trip to Dhaka in February 1926 was combined with his visits to several other places. From Dhaka, on 15 February 1926 he went to Mymensingh by train and visited Ananda Mohan College, Vidyamoyee Girls High School and other institutions. He went to nearby places such as Muktagachha and Atharobari. From there he traveled to Comilla on 19 February and stayed there until 26 February. He also visited Narayanganj on 8 February1926, right after his arrival at Dhaka.

Tagore's Settlement at Shantiniketan

Despite being the Zamindar of East Bengal estates, Rabindranath Tagore left Shelidah with his family for Shantiniketan in 1901. A piece of land at Bhubandanga, later named Shantiniketan, was purchased in 1863 by Maharishi Debendranath Tagore. He founded an Ashram (Temple) to promote Brahma philosophy. Later, Rabindranath Tagore himself founded the Brahma Vidyalaya school. In 1901 he established an open-air school. Besides contributing to various areas of literature and traveling around the world, he devoted his next forty years to further development of Shantiniketan. On 22 December 1918, foundation stone was laid for *Vishva Bharati University*. On 22 December 1921, this university was inaugurated. Initially, Vishva Bharati University had three Departments: Fine Arts, Music and Indology (history and cultures, languages, and literatures of India). This happened just eight years after he received the Nobel Prize in Literature in 1913.

Figure 6. Tagore at Vidyamoyee Girls High School

As mentioned earlier, many Rabindranath Tagore's writings in the 1890s were on humanity and social injustice in rural Bengal. When he was at Shantiniketan, he was found to adopt universal thoughts and philosophy that were applicable to the whole world. These are reflected in his poems, short stories, dramas, novels, essays, speeches, personal letters or actions related to host of topics such as agricultural reform, education, environment, governance, human rights, mankind, nationalism *vs*. imperialism, nature, religions, society, spirituality and world peace.

Conclusions

Rabindranath Tagore had a very productive period when he lived in East Bengal, which is now Bangladesh. Even after settling at Shantiniketan, he visited there frequently. His love for East Bengal never faded. A Chinese Rabindra scholar, Professor Dong Yu Chen told an audience at the *2017 International Literary Conference* held in Dhaka, that Rabindranath Tagore considered Bangladesh as his motherland and for this reason, he composed the song "Aamar Sonar Bangla". People in Bangladesh reciprocate this by paying tribute to Rabindranath Tagore by celebrating his life, singing his songs, reading his contributions, remembering him fondly, and calling him *Kobiguru* and/or *Gurudev*.

Rabindranath Tagore's claim on East Bengal as his motherland was fully justified. His ancestral connection to Jessore in Bangladesh is well known. Although partition of Bengal took place on 16 October 1905, it was rescinded on 12 December 1911 to quell a serious political turmoil. He opposed the partition of Bengal all along. Because he died earlier (in 1941), he did not see the second partition in 1947 when Bengal

became parts of two countries. In fact, he is a great son of both Bangladesh and India for which he composed national anthems. His noble prize in literature in 1913 gave him great prominence in the whole world, and with this he also made all of us very proud.

Acknowledgement

This article is based on various documents published in newspapers and Wikipedia, and on books such as "*Rabindranath Tagore: The Myriad Minded Man*, 1995" and "*Selected Letters of Rabindranath Tagore,* 1997*"* by Krishna Dutta and Andrew Robinson; "*Glimpses of Bengal*" by Rabindranath Tagore, 1921. *Rabindra Rachanabali* available through internet was also consulted.

Suparna Chatterjee

In Search of GuruDeb

Quintessentially a Bengali poet and a writer, Robi Thakur remains an altogether exceptional literary figure, towering over all others with his poems, songs, novels, plays, short stories, critical essays, and many more. His influence on Bengali writing is gigantic, he transformed the Bangla language and essentially formed the modern-day look and feel of Now.

In many ways, his writing not only reshaped and reconstructed the language for us but also made an amazingly powerful influence on our identity as a Bangali. We all got introduced to this remarkable, versatile man, in our childhood and we continue to explore his wide field of work as we each make our journey through life.

His work captures all occasions, sentiments, and moments of life that we feel in our mortal living. Whether it be the flutter of first love when honey warm eyes gaze at him for a fleeting moment, when a sea of unspoken words builds up as we progress through the rituals of life, every time we struggle through tempestuous nights, pining in grief for the loss of our loved ones, marooned in foreign land away from the familiarity of home, in confines of isolation, we seek refuge in Him.

We lovingly call him Robi Thakur, Thakur means God. Our admiration and respect for this mere mortal keep growing over the years, no matter when and where we live across the globe, we continue to celebrate his life and dutifully hand over a deep love for the man and his creation over to our next generation.

Many Bengalis will share a common childhood memory of having seen multiple volumes of his work shelved with love, not all may have been read, yet the desire to read remains, along with a regular homage paid with bowed head and an incense stick in hand, or folding hands in the gesture of a 'pronam' to his portrait that is hanging slightly off centred from an iron peg which remains lodged over years in our lightly cracked whitewashed walls of a middle-class home.

Publishing from the tender age of 7, Bhanusingha was the adopted pen name by young Rabindranath. He was attracted to the Maithili poems and hugely inspired by ancient poets, he was in his teens, when he composed Bhanusingher Padabali, seeking a divine connection, dedicating these compositions to his sister-in-law Kadambari Devi.

Even though the conventional tradition of his family expected him to make a career in law, he imagined an alternative educational system and of his many timeless accomplishments, Shanti Niketan remains to be the jewel in his crown. Here children learn sitting cross-legged under shady trees, looking up at floating clouds, and listening to bird's calls. Knowledge is gained through 360-degree dimension, while learning occurs following a prevalent convention of coming from the top, it also incorporates a more contemporary view of learning from peers, i.e., from each other, and then takes it furthermore with a confronting view of learning from those below, either in age or power. This made a significant breakthrough in the traditional learning curve, where it was perceived to be a torch of enlightenment passed from the top to below.

Rabindranath Tagore was the first-ever non-European to win a Nobel prize for his poetry collection titled Gitanjali. An unsatiated desire for creation kept him going, despite over two thousand songs in his repertoire he humbly says, I have spent many days stringing and unstringing my instrument while the song I came to sing remained unsung. For him, the most important lesson that mankind could learn from their mortal life is not that there is pain associated with living but that it is possible to transcend this pain and suffering and glide into an eternal joy as man has in him a silence of the sea, the noise of the earth and music of the air. He believed that divinity resides in us all.

A vast majority of his compositions that have tested the harsh reality of time, centre around divinity, merged with a profound love for nature. Tagore and his compositions will continue to remain seated in our hearts and soul even after 160 years and more, and we will continue to celebrate his values of life through his compositions. Kobi Guru, GuruDeb, Biswa Kobi, was a poet, artist, painter, but above all a true philosopher. Quite poignantly he says, when you came to this world you cried, and everybody smiled with joy; but, when you go, do smile, and smile wide, and let the world cry for you. He believed that death belongs to life as birth is a deliberate stroll of mankind, through the garden of life, raising each foot before laying one down.

The life and work of Tagore illumine how the fragrance of his living presence crowns the infinity of his kaleidoscopic creations. His poems and songs help us to focus on life's fulfilment, helping us through the range of obstacles that come our way. His short stories, novels, plays, articles, literary criticisms, memoirs, dance dramas, and books for children, both published and unpublished anthology of letters, makes us wonder about this enigma, to think of him essentially as a romantic poet, speaking of beauty and truth; maybe to define him as a transcendentalist; a believer in the absolute; or a propagandist for universal man; or maybe even as a national icon, however, the core to many of his creation remains poised with a fine balance between mortal love gradually transcending to the eternal.

We remain awe-struck at his prowess, we worship his ability to transcend borders and boundaries, we admire his multicultural concern, his patriotism, his stellar role as an ambassador of universal human understanding, his recognition of the world not merely as a storehouse of power but as a habitation of man's spirit, his genius in setting to human versatility in style that is both timeless and universal, we bow to him and his creative genius. He had in him a great calm, a generous detachment, a selfless love, and a disinterested effort, and as he found peace in himself, he spread it with selfless ease of comfort, making his compositions our anchor over generations. We ask him to guide us through the tempestuous nights, his songs make us shine brightly on a glorious morning, and when our heart swells in love, 'Kobi Guru Loho Pronam'.

Uddalak Bharadwaj

Love and Lure, A Tagorian Perspective

Bengalis, people speaking Bengali, hailing from West Bengal, the Indian state as well as Bangladesh (formerly part of an undivided Bengal, before partition of India in 1947), need no introduction to the songs written and composed by the poet laureate (Nobel, Literature, 2013), Rabindranath Thakur (permanently distorted to Tagore by the British), collectively referred to as Rabindrasangeet (sangeet: 'songs' in bengali language).

Bengalis live by these songs. Deeply profound and insightful of the realms of human heart and behavior, these songs are sensitive portrayals of every human emotion possible. Love and hatred, longing and rejection, love for the supreme being, deeply felt connection to nature and its endless allure, these songs are almost a way of life for Bengalis.

The bard had deliberately chosen to use less intricate melodies to stress upon the profound and heartfelt lyrics. Sometimes prosaic, sometimes esoteric, sometimes magical, these songs, although portraying all sorts of emotions, including the very sad and negative ones, never ever makes the listener lose hope. The song depicting even the most hopeless situation, ends with a note of positivity that the listener can hold on to. It's almost an alternate reality for all of us, Bengalis. Worn out by the drudgeries and insane brutalities of life, we cling on to Tagore for providing us support that probably only God can provide. No wonder his surname (the original one) Thakur, in Bengali means 'God'.

Although the bard became known to the world through the book, 'Song-offerings' (Geetanjali) it was a compilation of translations of around 51 of his songs, mostly spiritual, from his original Bengali book with the same name, 'Geetanjali' (meaning Song-offerings) along with additional poems from many of his other books. The non-Bengali listeners and readers are largely unaware of around 2150 songs that he wrote and composed, and which form a major portion of the repertoire of songs that Bengalis hear, during their life. And hence the need for translation of these songs.

There have been translations by Tagore himself and by many in India and abroad, which are largely curated at https://www.geetabitan.com/. I do not generally translate into English, but rather do translations, the other way round i.e. from English to Bengali. But, since last few years, I have been lucky to having had the privilege of learning Rabindrasangeet, from Shreya Guhathakurta, a Rabindrasangeet exponent and practitioner, after she moved to reside in Houston, my hometown. During my efforts to sing some of these songs along with musical tracks and posting these on social media, I had the urge of translating these for my non-Bengali speaking friends, including my wife Neeti and my in-laws, who happen to be Hindi-speaking.

Here, I present four songs of the bard, all around the topic of love and lure that speaks of love in its various hues and splendor and also, how the concept of love largely is set upon the wings of dreams and imagination and yet provide us with a tangible sense of happiness and excitement that sustains our souls. I must admit, that these four are merely a glimpse into the magic-world of Tagore, that is simply unending to explore. God-willing (read Thakur wiling) I will try to translate some more in future.

I sincerely hope I have been able to bring out the essence of what the bard had intended to say n these verses. I hope the esteemed world-wide Batayan readership, both Bengali and non-Bengali speaking, reads these and provide me feedback so that I could learn as a translator, especially since this direction of translating is new for me.

একটুকু ছোঁওয়া লাগে

একটুকু ছোঁওয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি
তাই দিয়ে মনে মনে রচি মম ফালগুনী ।

কিছু পলাশের নেশা, কিছু বা চাঁপায় মেশা,
তাই দিয়ে সুরে সুরে রঙে রসে জাল বুনি ॥
যেটুকু কাছেতে আসে ক্ষণিকের ফাঁকে ফাঁকে
চকিত মনের কোণে স্বপনের ছবি আঁকে ।
যেটুকু যায় রে দূরে ভাবনা কাঁপায় সুরে,
তাই নিয়ে যায় বেলা নূপুরের তাল গুনি ॥

A slight passing touch, few words spoken from her lips,
and I start weaving my spring night's song.
Like the addictively red Palash flower,
mixed with the beguiling fragrance of Chanpa
my melody spins the web of color and lure.

The fleeting moments that she is close, she
paints my mind with colors of dream.
The moments she is far, endless musings quiver
and my whole day passes, counting the rhythm
of her anklet bells.

আমি কেবলই স্বপন

আমি কেবলই স্বপন করেছি বপন বাতাসে –
তাই আকাশকুসুম করিনু চয়ন হতাশে ॥
ছায়ার মতন মিলায় ধরণী, কূল নাহি পায় আশায় তরণী,
মানসপ্রতিমা ভাসিয়া বেড়ায় আকাশে॥
কিছু বাঁধা পড়িল না কেবলই বাসনা-বাঁধনে ।
কেহ নাহি দিল ধরা শুধু এ সুদূর-সাধনে ।
আপনার মনে বসিয়া একেলা অনলশিখায় কী করিনু খেলা,
দিনশেষে দেখি ছাই হল সব হুতাশে ॥

Sowed have I, dreams onto this emptiness, constantly
And so in despair, I harvest the flowers of fancy.
Like a shadow, this world vanishes into the night
The boats of hope sinks, not a shore in sight
And the frenzied muses hover in the sky.

Couldn't gather anything in my desire-net
Nobody yielded to this distant devotion, reticent.
Seems it was a lonely game,
that I played with the fiery flame
Find only the scattered ashes of despair, spread

চৈত্রপবনে মন চিত্তবনে

চৈত্রপবনে মন চিত্তবনে বাণীমঞ্জরী সঞ্চলিতা
ওগো ললিতা
যদি বিজনে দিন বহে যায় খর তপনে ঝরে পড়ে হায়
অনাদরে হবে ধূলিদলিতা
ওগো ললিতা ॥

তোমার লাগিয়া আছি পথ চাহি – বুঝি বেলা আর নাহি নাহি।
বনছায়াতে তারে দেখা দাও, করুণ হাতে তুলে নিয়ে যাও –
কণ্ঠাহারে করো সঙ্কলিতা
ওগো ললিতা ॥

Oh, you, who hath stirred in me
these nascent words, like buds, on this windy spring day!
This summer sun's heat, if it turns them pale,
And they be wasted on the dirty forest roads
Oh you, the soft one!

Have been waiting for you, years
Not much time is left, I fear.
Appear in the forest shadows
Pick them up with your tender hands
Wear them in a garland around your neck
Oh you, the soft one!

না চাহিলে যারে পাওয়া

না চাহিলে যারে পাওয়া যায়, তেয়াগিলে আসে হাতে,
দিবসে সে ধন হারায়েছি আমি – পেয়েছি আঁধার রাতে ॥
না দেখিবে তারে, পরশিবে না গো, তারি পানে প্রাণ মেলে দিয়ে জাগো –
তারায় তারায় রবে তারি বাণী, কুসুমে ফুটিবে প্রাতে ॥
তারি লাগি যত ফেলেছি অশ্রুজল
বীণাবাদিনীর শতদলদলে করিছে সে টলোমল।
মোর গানে গানে পলকে পলকে ঝলসি উঠিছে ঝলকে ঝলকে,
শান্ত হাসির করুণ আলোকে ভাতিছে নয়নপাতে ॥

The gift that comes your way, without ask or pray,
Ends up in your palms even if you keep it at bay,
I have lost the treasure at day, only to regain it
in the still of night

I ought not see her, or touch her ever
And yet flows my life, blossoming, unto hers.
Her voice among the stars
Waking softly, the eager morning bloom.

All the tears I shade for her,
gleams like drops on a lonely lotus leaf.
Keep coming back to glisten my songs, they
Like, through the foliage pour the sun's ray
Like the tender glow in a quiet smile
that glistens the kindred eye

Arpita Chatterjee — Postdoctoral Research Associate, Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Nebraska Medical Center, Omaha, NE-68198.

Bhajendra N. Barman is a Ph D Chemist who hails from Bangladesh. Now he is retired as a Senior Principal Scientist. He writes infrequently on social and contemporary issues in both English and Bengali. He belongs to a literary group of Probash Bandhu at Houston, Texas.

গৌরী মৃণাল – পেশাগতভাবে ব্যাংকের সাথে যুক্ত থাকলেও বরাবর সাহিত্যই প্রথম ভালবাসা। তবু লেখালেখি সিরিয়াসলি শুরু করতে করতে প্রায় অপরাহ্নবেলা। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি।

ইন্দিরা চন্দ – মেয়েবেলা কেটেছে মহারাষ্ট্র-র নাগপুরে। তারপর কোলকাতা। মনোবিদ্যা নিয়ে স্নাতকোত্তর পড়াশোনা করতে করতেই বিয়ে। তারপর কর্মসূত্রে রাজস্থান, গুজরাট, মুম্বাইতে থেকে ২০০১ সাল থেকে দেশের বাইরে। ওমান এবং সংযুক্ত আমিরশাহীতে বেশ কিছু বছর কাটিয়ে ২০০৮ সাল থেকে অস্ট্রেলিয়ার পার্থ-এ পাকাপাকি বাস। পেশায় হলেও নেশায় চিরকালই লেখালেখি। কবিতা, গান, নাটিকা, নাটক সব ক্ষেত্রেই নিজের প্রতিভার ছাপ রেখেছেন তিনি। পার্থ-এর বঙ্গরঙ্গ থিয়েটার গোষ্ঠী ওনার লেখা মঞ্চস্থ-ও করেছে। বহুদিন ধরে কলম ধরলেও তুলি ধরেছেন এই প্রথম। পুরোপুরি স্বশিক্ষিত শিল্পী। নাচ এবং গানে প্রশিক্ষণ থাকলেও আঁকা শেখেননি কোনোদিন। কিন্তু কবিতার বিষয়বস্তু এবং ছন্দের মতন ছবিগুলি রঙের ব্যবহার আর তুলির টান মন কাড়ে তার মননশীলতায়।

মহুয়া সেন মুখোপাধ্যায় – বেড়ে ওঠা কলকাতায়, বসবাস বস্টনে। লেখালেখি শুরু ২০১৬ তে। ছোট গল্প এবং আর্টিকেল প্রকাশিত হয়েছে বাংলা লাইভ, পরবাস, কল্পবিশ্ব ওয়েব ম্যাগাজিনে, আনন্দবাজার, সাপ্তাহিক বর্তমান, সংবাদ প্রতিদিন, রোববারে। ২০২০র বইমেলায় প্রকাশিত প্রথম বই-ছোট গল্প সংকলন-ক্যালাইডোস্কোপ, দে'জ পাবলিকেশন থেকে।

রমা জোয়ারদার – দিল্লীর বাংলা সাহিত্য মহলে একটি পরিচিত নাম। গত কুড়ি বছর ধরে দিল্লী, পশ্চিমবাংলা ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর গল্প, প্রবন্ধ, রম্য রচনা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়ে চলেছে। বিজ্ঞানের ছাত্রী হওয়া সত্বেও তিনি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে ছেলেবেলা থেকেই অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। প্রকাশিত ছোট গল্প সংকলনঃ (১) রোজ নামচার ছেঁড়াপাতা; (২) সবুজ ঢেউ আর ঝাপসা চাঁদ।

রমা সিনহা বড়াল – পেশায় স্থপতি ও নগর পরিকল্পনাবিদ। বি.ই. কলেজের স্থাপত্য বিভাগের স্নাতক ও খড়্গপুর আই. আই. টি নগর পরিকল্পনাবিভাগের স্নাতকোত্তর। "কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি" র নগরোন্নয়ন বিভাগে পরিকল্পনাবিদ হিসাবে কর্মরত ছিলাম। বর্তমানে ঐ বিভাগের "এডিশানাল ডিরেকটর" হিসাবে অবসর গ্রহণ করেছি। অবসর সময় নানা ই-ম্যাগাজিনে কর্মজীবনে নিজের অভিজ্ঞতার গল্প লিখতে ভালবাসি। ছোটবেলায় বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ক্যাম্পাসের সুন্দর পরিবেশে বড় হয়েছি। বাবা ছিলেন স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ প্রফেসর শঙ্কর সেবক বড়াল। তাঁর ও আমার দিদি, দাদার উৎসাহে বিজ্ঞান ভিত্তিক কল্প কাহিনী লিখতে ভালবাসতাম। আজ আমার একসাথে বড়ো হওয়া, ছোটবেলার প্রিয়বন্ধু,অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী নূপুর (অনুশ্রী) এর উৎসাহে, বিজ্ঞান ভিত্তিক কল্প কাহিনী "জেমস ওয়েব এর টেলিস্কোপ", বাতায়ণের মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে পেশ করলাম।

রূপা মজুমদার – বাংলা সাহিত্য জগতে পরিচিত অক্ষরকর্মী। বৈবাহিক সূত্রে দেব সাহিত্য কুটির পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হন এবং ২০১৫ সাল থেকে দেব সাহিত্য কুটিরের কর্ণধার। সম্পাদনা করেছেন নবকল্লোল শুকতারা। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন যেমন জাগো বাংলার ফিচার এডিটর, বাঙলা OTT platform hoichoi এর কন্টেন্ট consultant. সম্প্রতি নিজস্ব প্রকাশনা করেছেন Raunaq Publication. যুক্ত আছেন আমেরিকার বঙ্গ সম্মেলন কমিটির সঙ্গে ২০২১ থেকে। দেশ এবং বিদেশের বহু সেমিনারে আমন্ত্রিত হয়েছেন বাংলা সাহিত্য নিয়ে বক্তব্য রাখার জন্য, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ২০১৯ বাংলাদেশ, ২০২০ প্যারিস, ২০২২ লাসভেগাস। তিনি পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশনের সদস্য, রোটারি ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট, বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স এর সদস্য এবং একাধিক কাগজ ও পত্রিকাতে লেখালেখি করেন নিয়মিত।

সংগ্রামী লাহিড়ী – ইঞ্জিনিয়ার, পেশায় কনসালট্যান্ট। শাস্ত্রীয় সংগীত নিয়ে বহুদিনের চর্চা। অল ইন্ডিয়া রেডিওর এ গ্রেড শিল্পী। লেখালেখির অভ্যাসও ছোট্টবেলা থেকে, বাবা-মা'র উৎসাহে। বর্তমানে কর্মসূত্রে নিউ জার্সির পারসিপেনি শহরে বসবাস। তবে বিদেশে বসেও সাহিত্যচর্চা চলে জোর কদমে। নিউ জার্সি থেকে প্রকাশিত 'অভিব্যক্তি' ও 'অবসর' পত্রিকার সম্পাদক। এছাড়া 'পরবাস', 'উদ্ভাস', 'প্রবাসবন্ধু', 'টেকটাচটক', 'গুরুচণ্ডা৯', ইত্যাদি ই-ম্যাগাজিনের নিয়মিত লেখিকা।

সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায় – ঐতিহ্যময় শহর চন্দননগরের স্থায়ী বাসিন্দা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির স্নাতক। ১৯৯৬ সালে প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় 'দিবারাত্রির কাব্য' পত্রিকায়। ২০০১ সালে 'দেশ' পত্রিকায় প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। 'আনন্দবাজার', 'বর্তমান', 'আজকাল', 'প্রতিদিন', 'তথ্যকেন্দ্র', 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' ছাড়াও, 'অনুষ্টুপ', 'কুঠার', এবং 'মুশায়ারা'-র মতো বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনেও তার কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রকাশের ধারা অব্যাহত। প্রকাশিত উপন্যাস পাঁচটি, গল্পগ্রন্থ তিনটি, এবং কবিতার বই একটি।

শেলী শাহাবুদ্দিন – একজন চিকিৎসা বিজ্ঞানী। বাংলাদেশে স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি বিষয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণা করেছেন পঁচিশ বছর এবং একটি গবেষণা প্রকাশনা আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রাপ্ত। বাংলায় লেখা-লেখির আগ্রহ শৈশব থেকে। শুরুটা বিভিন্ন সংকলনে। আমেরিকায় অভিবাসী হয়ে আসেন ২০০১ সালে। হিউস্টন থেকে প্রকাশিত দ্বিবার্ষিক সাহিত্য পত্রিকা "প্রবাস-বন্ধু"র, ওয়াশিংটন থেকে প্রকাশিত সাহিত্য "সাময়িকী" স্বদেশ-শৈলীর এবং প্রগতিশীল প্রকাশনা "নাগরিক" এর নিয়মিত লেখক। প্রবন্ধ ও গল্প লেখেন বিভিন্ন বিষয়ে। তাঁর অল্প কিছু কবিতাও প্রকাশিত হয়েছে। লেখার বিষয় প্রধানত মুক্তিযুদ্ধ, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা এবং ভ্রমণ। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা – চার।

সৌমিত্র চক্রবর্তী – পেশায় চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। নিজেকে যতটা সম্ভব আড়ালে রেখে আর্থিকভাবে দুর্বল স্কুল পড়ুয়াদের জন্য কাজ করতে ভালোবাসেন। তাদের জন্যেই ভালোবাসার উপহার 'খেলার ছলে' পত্রিকার মূল কান্ডারি। তাঁর কবিতা, ছোটগল্প ইতিমধ্যেই 'দেশ', শারদীয়া আনন্দবাজার, বা সাপ্তাহিক বর্তমানের মত বহুল প্রচারিত পত্রিকায় জায়গা পেতে শুরু করেছে। এবারেই প্রথম কলম ধরেছেন বাতায়নের পাঠকদের জন্য।

সুজয় দত্ত – ওহায়োর অ্যাক্রন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যানতত্ত্বের (স্ট্যাটিস্টিক্স) অধ্যাপক। জৈবপরিসংখ্যান বিশ্লেষণতত্ত্বের (বায়োইনফর্মেটিক্স) ওপর ওঁর একাধিক বই আছে। কিন্তু নেশা তাঁর সাহিত্যে। সাহিত্য তাঁর মনের আরাম। গত বারো বছরে আমেরিকার আধ ডজন শহর থেকে প্রকাশিত নানা সাহিত্যপত্রিকায় ও পূজাসংখ্যায় তাঁর বহু গল্প, কবিতা, রম্যরচনা ও অনুবাদ বেরিয়েছে। তিনি ''প্রবাসবন্ধু'' ও ''দুকূল'' পত্রিকা সম্পাদনা ও সহসম্পাদনার কাজও করেছেন।

সুমিতা বসু – বর্তমানে হিউস্টন টেক্সাস-এ বাস। এর আগে বস্টনে কেটেছে দুই দশকেরও বেশি। বিদেশে কেটে গেল বহু বছর আর নিত্যদিনের কাজের সূত্রে সম্পূর্ণ অন্য অভিজ্ঞতা হলেও, মনের ভেতর নাড়া দেয় মাতৃভাষা। তাই নিয়মিত সাহিত্য চর্চা বাংলাতেই। ছোটগল্প, কবিতা আর প্রবন্ধ – স্বচ্ছন্দ বিচরণ। বেশ কিছু বইয়ের সম্পাদনার কাজও করেছেন, অনেকদিন বই প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত।

সুপর্ণা চট্টোপাধ্যায় – অস্ট্রেলিয়ার পার্থে বসবাস। দুই ছেলে, স্বামী, NRIর সংসার, full time কাজ, ফাঁক ফোকরে লেখা লেখি, লিখবো বলে অনেক কথা খুঁজি / লিখছি যা তার সব মানে কি বুঝি !

অধমের নাম **সুপ্রতীক মুখোপাধ্যায়**। পার্থিব বাসিন্দা। ৯টা-৫টার চাকর। পিদিমের মত টিম্‌টিমে বুদ্ধি, তা'ও নেভে না !!

Surajit Roy – Assit. Professor, Visvabharati Santiniketan, Sangeet Bhavana, Dept. of Rabindra Sangeet. Doctorate in Rabindra Sangeet. An eminent Esraj player as well as a rabindra sangeet singer. Dr. Roy took part so many prog. and seminars all over the world.

স্বপ্না চৌধুরী – ভ্রমণ নিয়ে feature, প্রবন্ধ লেখেন। অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক।

স্বপ্না মিত্র একজন প্রবাসী বাঙালি। বিজ্ঞানের ছাত্রী। রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ থেকে রেডিও-ফিজিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স নিয়ে বি-টেক করে বেশ কিছুদিন দেশি এবং বহুজাতিক সংস্থায় কাজ করেছেন। চিরদিনই হার্ডকোর হবি ছিল রিডিং, লেখালেখি ছিল একান্তই ব্যক্তিগত ভালোবাসার জায়গা। ইদানীং বেশ কিছু লেখা আত্মপ্রকাশ করেছে প্রিন্টেড ম্যাগাজিনে (দেশ, সানন্দা, সাপ্তাহিক বর্তমান, বর্তমান, আনন্দমেলা, বাংলা ফেমিনা, আনন্দবাজার, আজকাল), বিভিন্ন ওয়েব ম্যাগাজিনে এবং বই হিসেবে।

তপনজ্যোতি মিত্র – সিডনির বাসিন্দা, পেশায় আই. টি.। কাজের শেষে প্রতিদিন বইয়ের জগতে ফিরে যান। রবীন্দ্রনাথ/জীবনানন্দ সহ বিভিন্ন লেখকের লেখা পড়ার মাঝে কখনো সখনো নিজেরও দু এক লাইন লেখার বিনীত প্রয়াস। বিভিন্ন প্রকাশিত গল্প কবিতা 'বসন্তের জলাশয়ে প্রতিচ্ছবি', 'অমৃতের সন্তানসন্ততি', 'ঈশ্বরকে স্পর্শ', 'মায়াবী পৃথিবীর কবিতা', 'সুধাসাগর তীরে', 'সে মহাপৃথিবী', 'আকাশকুসুমের পৃথিবী'। কবিতা আবৃত্তি ও গল্প পাঠের বাচনিক শিল্পও করতে ভালবাসেন।

এম ডি এন্ডারসন ক্যান্সার সেন্টার-এ গবেষণায় রত **উদ্দালক** অবসরে কবিতা পড়া, লেখা এবং অনুবাদ নিয়ে থাকতে ভালবাসেন। উদ্দালকের কবিতা এবং অনুবাদ, কলকাতা এবং আমেরিকার বিভিন্ন পত্রিকা যেমন প্রবাসবন্ধু, দুকূল, বাতায়ন, সংবাদ-বিচিত্রা, স্বজন, প্রথম আলো, ভাষাবন্ধন, অর্কিড, ম্যাজিক-ল্যাম্প, স্বপ্নরাগ ইত্যাদিতে ছাপা হয়েছে। বঙ্গীয় মৈত্রী সমিতি দ্বারা প্রকাশিত বাংলার বাইরে বসবাসকারী লেখকদের কবিতা সংগ্রহ "কবিতা পরবাসে" এবং আন্তর্জাতিক বিজয়ওয়াড়া সাংস্কৃতিক সংস্থা এবং অমরাবতী দ্বারা প্রকাশিত আন্তর্জাতিক, বহুভাষী কবিতাসংগ্রহ, Poetic Prism-এও স্থান পেয়েছে উদ্দালকের কবিতা। কবিতার বিষয় মূলত প্রেম হলেও, জীবনের আরও নানান উপলব্ধির প্রতিক্রিয়ায়ও উদ্দালক প্রকাশ করে রাখেন তার অনুভব। কখনো তা কবিতা হয়, কখনো শুধুই স্বগতোক্তি। সম্প্রতি নিউ জার্সির আনন্দ মন্দির প্রদত্ত গায়ত্রী স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত হন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তার সাহিত্যকর্মের উৎকর্ষতার জন্যে। স্ত্রী নীতি ও পুত্র সায়ন-কে নিয়ে উদ্দালক টেক্সাসের হিউস্টন শহরে থাকেন।

ISBN 978-0-645-57264-3